শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী
বন্ধুবরেষু

১

মন বলছে, হবে না। ফিরে যাই। দরকার নেই।

গেট পর্যন্ত এসে একবার পিছিয়েও গিয়েছিল ক' পা। বোধ হয় নিজেরও অজান্তে। কিন্তু, না, এতদূর যখন এসেছে তখন বাকিটুকু দেখে যেতে দোষ কী। হবে না তো হবে না। না হবার আগেই ফিরি কেন ? মরব তো একবারই মরব।

আর, দরকার নেই বলছ ? ভীষণ দরকার। মর্মান্তিক দরকার।

গেটের ছিটকিনিটা আলগোছে খুলল ভাস্কর। না, কুকুর নেই। থাকলে এতক্ষণে সোরগোল পড়ে যেত। তা ছাড়া, উকিলের বাড়ি, যেখানে বহু লোকের আনাগোনা, সেখানে কুকুর চলে না।

নির্ভয়েই গেটটা ঠেলল ভাস্কর। আর্তনাদের মত একটা আওয়াজ উঠল। আগন্তুক কেউ ঢুকছে, গৃহস্বামী সচকিত হলেন।

'কী চাই ?' বইয়ের দেয়াল দিয়ে গাঁথা সাজানো ঘরটাতে ঢুকতে যত না ঘাবড়েছিল, কণ্ঠস্বরে বেশি ঘাবড়াল ভাস্কর।

'কে আপনি ?' জগৎপতি শূন্য চোখে তাকাল : 'আপনাকে তো চিনতে পারছি না।'

'আমি এ পাড়াতেই থাকি। আমার নাম ভাস্কর বসু।'

'কোনোদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।' জগৎপতি দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করলেন : 'কী দরকার ?'

কাছাকাছি অনেক চেয়ার পড়ে আছে। একটার দিকে করুণ চোখে তাকাল। নম্র আঙুলে একটু স্পর্শও করল একটাকে। ভাস্করের মনে হল, নিতান্ত কাঠ বলেই চেয়ারটা প্রতিবাদ করল না। নইলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একশেষ করত।

জামার পকেট থেকে কতগুলি কাগজ বের করল ভাস্কর।

'কোনো কেস ? বসুন।'

চেয়ারের মাঝখানে নয়, চেয়ারের ধারে আড়ষ্ট হয়ে বসল ভাস্কর।

'কিন্তু, শনিবার, আজ আমার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আপনি কাল আসবেন।'

'কোনো কেস নয়।'

'কেস নয়?' সংসারে তবে আর কী হতে পারে, কী থাকতে পারে, জগৎপতি অবাক হবার ভাব করলেন ঃ 'তবে কাগজপত্র কিসের?'

যেন কত বড় হার, কত বড় লজ্জা, ভাস্করের গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে এল। বললে, 'একটা চাকরি—'

'চাকরি?' আকাশ থেকে পড়বার মতন মুখ করলেন জগৎপতি ঃ 'এখানে চাকরি কোথায়?'

'চাকরি নয়, চাকরির দরখাস্ত।' ক্লিপ-আঁটা এক তাড়া কাগজ থেকে একটা আলগা করতে চাইল ভাস্কর।

'দরখাস্ত—তা আমাকে কী করতে হবে? লিখে দিতে হবে? দেখে দিতে হবে?' স্বরে একটু ব্যঙ্গ মেশালেন জগৎপতি ঃ 'ভুল ইংরিজি কারেক্ট করে দিতে হবে?'

'না।'

'তবে? বলুন না, কী করতে হবে। আমার সময় নেই—' উঠি-উঠি ভাব করলেন জগৎপতি।

'আমাকে আপনি করে বলছেন কেন?' নিচু চোখ উঁচু করল ভাস্কর ঃ 'আমি কত ছোট।'

'না, মশাই, ছোট-বড় কেউ নেই। মানুষ হয়ে জন্মাবার সম্মানে সকলে সমান।' জগৎপতি ফের চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'চুপ করে রইলেন কেন? কী করতে হবে আমাকে তাই বলুন।'

'বিশেষ কিছুই নয়।' লঘু হবার চেষ্টায় একটু বুঝি বা হাসল ভাস্কর।

'বিশেষ-অবিশেষ যাই হোক বলবেন তো কথাটা।' জগৎপতি

এবার প্রায় ধমকে উঠলেন ঃ 'ইয়ং ম্যান, যা বলবার তা বলতে পারেন না ঝটপট ? এতটুকু ব্যক্তিত্ব নেই ? বলুন কী চাই ? কী করতে হবে আমাকে ?'

'একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে।'

'কী দিতে হবে ?' উঠতে যাচ্ছিলেন, ফের বসে পড়লেন জগৎপতি।

'সার্টিফিকেট।'

'কেন, আমি কি গেজেটেড অফিসর ?'

'গেজেটেড অফিসরের দরকার নেই। যে কোনো বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হলেই চলবে। এই দেখুন না ফর্মটা—' কাগজের তাড়া নিয়ে আবার একটু ব্যস্ত হল ভাস্কর।

'আর রাজ্যে ভদ্রলোক নেই ?'

'তেমন কাউকে চিনি না।' ভাস্কর অপরাধীর মত মুখ করল।

'আর আমাকে চেনেন ?'

'আপনাকে কে না চেনে ! আপনার কত নাম-ডাক। কত প্রভাব-প্রতিপত্তি !'

একটু কি গললেন, ঝুঁকলেন জগৎপতি ? জিগগেস করলেন, 'কী লিখতে হবে ?'

'এমনি শাদা কাগজে নয় স্যার, আপনার লেটার পেপারে লিখবেন—'

'কী লিখব তাই বলুন না।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন জগৎপতি।

'সামান্য—শুধু এক লাইনের একটা কথা। আপনি যদি লিখে দেন, আপনার মত লোক যদি লিখে দেয়, তাহলেই আমার চাকরিটা হয়ে যায়।'

'হয়ে যায় !' ব্যঙ্গে ঝলসে উঠলেন জগৎপতি ঃ 'কিন্তু কী আশ্চর্য, কথাটা কী !'

'কিছুই নয়—এই লিখে দেবেন, আমাকে আপনি চেনেন আর আমার নৈতিক চরিত্র ভালো।'

'কী চরিত্র ?'

'নৈতিক চরিত্র। তাই চেয়েছে। এই দেখুন—' ভাস্কর কাগজ নিয়ে আবার ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করল।

'তা আপনার নৈতিক চরিত্র ভালো কি মন্দ তার আমি কী জানি ?'

যেন মাটিতে বসে পড়ল ভাস্কর। তবু যেন সমস্ত আশা এক নিমেষে খুইয়ে বসল না। বললে, 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমাকে কী অসৎ বলে মনে হয় ?'

'অসৎ ?' হা-হা করে হেসে উঠলেন জগৎপতি। কাঠ-কাঠ কৃত্রিম হাসি।

ভাস্করের মনে হল কথাটা বুঝি ঠিক হয়নি। তাই স্বর সারল্যে ভরে নিয়ে বললে, 'আমি যে ভালো আমার মুখ দেখে এ আপনার বিশ্বাস হয় না ?'

'ভালো ?' হাসতে চেয়েও হাসলেন না জগৎপতি। বললেন, 'আমার সঙ্গে চলুন কোর্টে। দেখে আসবেন। মুখে সব স্বর্গের ছবি আঁকা, কিন্তু ভেতরে একেকটি চোরাগোপ্তা। মুখ দেখে ভোলবার বয়েস আর নেই।'

হঠাৎ পাশের প্যাসেজ থেকে কে ডেকে উঠল : 'বাবা, আমাদের হয়েছে।'

ও, হ্যাঁ, এই উঠি।' ত্রস্তব্যস্ত হবার ভঙ্গি করলেন জগৎপতি : 'খবরের কাগজে চোখ বোলাবার জন্যে বৈঠকখানায় ঢুকলাম, সঙ্গে সঙ্গে লোক—'

'কাগজ-টাগজ সব নিয়ে যাব।' বাইরে থেকে আবার তাড়া এল : 'তুমি চলে এস।'

উঠছেন, ভাস্কর আবার বাধা দিল। বললে, 'সরাসরি যদি না পারেন ঘুরিয়েও তো পারেন লিখতে। আপনার হাতের যা-হোক একটা লাইন পেলে—যেমন ভাবে হোক—'

'ঘুরিয়ে লিখতে হবে ?' উঠে দাঁড়ালেন জগৎপতি।

'অন্তত এভাবে লিখুন, এর নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে আমি কিছু জানি না।'

'আপনার কাছ থেকে শিখে নিয়ে লিখতে হবে ?'

'না, তা বলছি না তবে—' রিক্ত আঙুলে কাগজগুলো আঁকড়াল ভাস্কর ঃ 'তবে ওতে বিবেকের সঙ্গে সামান্যতম মীমাংসা চলে হয়তো।'

'না, চলে না।' চোয়ালের হাড় দৃঢ় করলেন জগৎপতি। বললেন, 'অমনি ঘুরিয়ে বলাটাকে সৎ বলে না। আপনার সৎ-অসতের ধারণা কী তা বোঝা গেল। ছলনা কখনো সৎ নয়।'

তুর্বল মুখে ভাস্কর একটু হাসল। বললে, 'নৈতিক চরিত্রের সার্টিফিকেট চাওয়াটাই একটা ছলনা। আর, ছলনার সঙ্গে ছলনার মোকাবিলা করাটাই তো সার্থক ওকালতি।'

'ও, আপনি উকিল বুঝি একজন ?' তেরছা করে তাকালেন জগৎপতি।

'না, ছি, উকিল হতে যাব কেন ?'

'জানেন আমি একজন উকিল ?'

'ও, হ্যাঁ, মাপ করুন।' সাত হাত জলের নিচে পড়েছিল, তক্ষুনি আবার সামলাল ভাস্কর ঃ 'আমি সেই ভেবে আপনার কাছে আসিনি। একজন উদার পরোপকারী মহানুভব ব্যক্তি ভেবে আপনার কাছে এসেছি।'

'কিন্তু সবার উপরে সত্য—সত্যটা দেখবেন তো ?' জগৎপতি হুমকে উঠলেন ঃ 'ঐ প্রথম কথাটা, আসল কথাটায় হ্যাঁ। বলি কী করে ? প্রথমেই লিখতে হবে, আপনাকে আমি চিনি। বলুন, আমি চিনি আপনাকে ? কোনোদিন দেখেছি ?'

শিশুর মত হেসে উঠল ভাস্কর। বললে, 'এই তো আমাকে দেখলেন। চিনলেন। মানুষকে দেখতে-চিনতে কতক্ষণ লাগে ?'

'আচ্ছা—' ভিতরের দরজার দিকে হঠাৎ তাকালেন জগৎপতি : তক্ষুনি আবার মুখ ফেরালেন এদিকে ঃ 'আচ্ছা, আপনি এ পাড়ার তরুণ-সমিতিকে চেনেন ?'

'তরুণ-সমিতি—' নামটা বার কতক আওড়ে ভাস্কর স্মৃতিটাকে উজ্জ্বল করতে চাইল।

'অন্তত তাদের কেউ আপনাকে চেনে ?' হঠাৎ ভিতরের দরজার উদ্দেশে মুখরিত হলেন জগৎপতি ঃ 'রুচি, রুচি !'

সঙ্গে-সঙ্গেই একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

জগৎপতি জিগগেস করলেন, 'তুই এই ভদ্রলোককে চিনিস ? তোদের তরুণ-সমিতির মেম্বর ?'

ভদ্রমহিলাকে উত্তর দেবার একটা সুযোগ দিতে হয় ! তাই মুখ তুলল ভাস্কর।

'না, না, চিনি না, দেখিনি কোনোদিন।' জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল রুচিরা ঃ 'শুভময় বলতে পারে।'

'কেন, তুইও তো সমিতির জয়েণ্ট সেক্রেটারি।' সগর্বস্নেহে তাকালেন জগৎপতি।

'হ্যাঁ, সে দিক থেকে বলতে পারি,' নিজের থেকে রুচিরা এবার তাকাল ঃ 'নন ইনি মেম্বর।'

'তার জন্যে এত পরিশ্রমের দরকার কী ! সে তো আমিই বলতে পারতাম।' ভাস্কর অস্ফুট একটু হাসল।

সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন জগৎপতি। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলছেন পাড়ায় থাকেন, তবু এঁকে মেম্বর করা হয়নি ?'

এটা কী রকম সওয়াল হল ! বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকোলো রুচিরা। পাড়ায় যত কাগা-বগা-অঘা আছে সবাইকে মেম্বর করতে হবে ? যে অসভ্য তাকে কি উচিত সভ্য করা ? কিন্তু বাবার যুক্তির মুখোমুখি

হওয়া দরকার। তাই রুচিরা ঝিলকিয়ে উঠল : 'তা হলে উনি থাকেন না পাড়ায়।'

'না, না, উনিশ-এফ-এ আমি থাকি, যদি চান তো দেখে আসবেন।' বলেই আবার চোখ নামাল ভাস্কর। বললে, 'তবে মেম্বর করতে চাইলেই হতাম কিনা ঠিক নেই।'

'কেন, পয়সা নেই? দুঃস্থ গরিব?' জগৎপতি প্রায় মুখ বেঁকালেন।

'তা তো বটেই। তা ছাড়া রুচিরও তো একটা কথা আছে।' বলেই অজান্তে চমকে উঠল ভাস্কর, পাপ মুখে কারু নাম নেওয়া হয়ে গেল বুঝি। বলেই সামলাল তৎক্ষণাৎ: 'তার মানে ওটা তো একটা নাচ-গান-ফুর্তির আড্ডা বলে শুনেছি।'

'শুনেছেন? কেন, নাচ-গান-ফুর্তি খারাপ?' জগৎপতি এবার স্পষ্ট রুষ্ট হলেন: 'আপনি সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন না?'

কাগজপত্র গুটোতে লাগল ভাস্কর। বুঝল আশার শেষ রেখাটুকুও মিলিয়ে গেল। তাই বুঝি, চেষ্টা না করলেও, একটি ব্যঙ্গের রেখা ঠোঁটে ফুটে উঠল। বললে, 'ওটা তো সংস্কৃত করে বলা। কিন্তু আসলে, খাঁটি বাংলায়, ওটা একটা উচ্ছৃঙ্খলতার ডিপো।'

'জানেন তরুণ-সমিতির প্রেসিডেন্ট আমি?' জগৎপতি প্রায় বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন।

লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল ভাস্কর। বেআইনি ভাবেই এতক্ষণ বসে ছিল চেয়ারে, আশা ছেড়ে দিয়ে দুরাশাকে আঁকড়ে ধরে। এবার উঠে পড়ল। বললে, 'আমাকে মাপ করবেন। আমি তরুণ-সমিতি নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। তরুণ-সমিতি দীর্ঘজীবী হোক। আমি এসেছিলাম আপনার একটা দস্তখতের জন্যে—'

'বাবা, চলে এস, আর সময় নেই, এখুনি সবাই এসে পড়বে—' প্রায় ঝাঁপিয়ে-পড়ার মত করে বললে রুচিরা। বেরিয়ে গেল ঘর

থেকে। বেরিয়ে মা এণাক্ষীকে কাছে পেয়েই একেবারে তেলেবেগুনে হয়ে উঠল ঃ 'দেখ না, বাবা কোন একটা বাজে লোকের সঙ্গে বসে তরুণ-সমিতি নিয়ে চর্চা করছেন। যার-তার সঙ্গে কী দরকার আলোচনা করা। ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে,'—ডানহাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাল একবার রুচিরা।

দেরি হয়ে যাচ্ছে অথচ আলোচনায় আটকে আছেন, কে সেই লোক, কৌতূহলী হল এণাক্ষী। একটা অসফল উঁকি মেরে ঝাপসা গলায় জিগগেস করলেন, 'কে লোক ?'

'কে জানি কে! বাবার একটা দস্তখতের জন্যে পিড়াপিড়ি করছে।' আশেপাশের সকলকে শুনিয়ে খরস্বরে বললে রুচিরা, 'কিন্তু —দস্তখত নিবি তো ফি কই ? ন্যায্য ফি ছাড়া উকিল কখনো কলম ধরে নাকি ?'

কথাটা লুফে নিল ভাস্কর। বললে, এমনি 'সার্টিফিকেটের জন্যে ফি নেন আপনি ?'

বেফাঁস কথায় রুচি-টা একেক সময় এমন অপ্রস্তুত করে, জগৎ-পতি ভ্রূকুঞ্চন করলেন। বললেন, 'না। আপনাকে আমি চিনি না। তাই এক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেওয়া অসম্ভব। ফি-এর কথা বলছেন, ফি দিতে চাইলেও অসম্ভব। যখন চিনি না তখন আমি অসহায়। সুতরাং—'

'চলে যান।' ভাস্কর হাসল ঃ 'চলেই যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাই বলুন। কোথায় পাই তেমন বড়লোক ?'

'না পান তো আমি কী করব ?' স্বরে ঝাঁজ আনলেন জগৎপতি।

'এমন সব সৃষ্টিছাড়া নিয়ম করে যার মাথমুণ্ডু হয় না।'

'যারা নিয়ম করেছে তাদের মাথামুণ্ডু পাত করুন গে। এখানে কিছু হবে না।' জগৎপতি মুখ ফেরালেন।

তক্ষুনি একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

এণাক্ষী চাঞ্চল্যে ঝলমল করে উঠল : 'শুভময়রা এল বুঝি ?'

'না, না, শুভময় তো স্টেশন ওয়াগন নিয়ে আসবে।' রুচিরা মাকে সংশোধন করল : 'এ মিস্টার চক্রবর্তী এসেছেন।'

অরিন্দম চক্রবর্তী। ইনজিনিয়র। জগৎপতি বেরিয়ে আসতেই অরন্দিম বললে, 'আমার সঙ্গে ইনি কণাদ দত্তগুপ্ত। চার্টার্ড য়্যাকাউণ্টেণ্ট।'

'উনিও জয়েন করছেন নাকি ?' ঢেউ তুলে দু পা এগিয়ে এল রুচিরা।

'সেই মতলোবেই তো নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে।' জয়ীর মত হাসল অরিন্দম।

'তা হলে প্রথমেই তো ওঁর মেম্বর হতে হয়।'

'ওরে বাবা, কী ঝানু সেক্রেটারি! কারু ফসকে যাবার উপায় নেই।' অরিন্দম হেসে উঠল : 'একেবারে লাইফ মেম্বর হয়ে যাবে।'

'সঙ্গে চেক বই আছে।' কণাদ প্রথমে কোটের পকেটে চড় মারল কিন্তু রুচিরা তবু তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে দেখে সরাসরি খুলেই দেখাল চেক-বই।

জগৎপতি অভ্যর্থনা করে উঠলেন : 'বা, ভালো কথা।'

'কিন্তু এ আপনারা করেছেন কী ?' রুচিরা ঝলসে উঠল।

'কী করেছি ?' এপাশ ওপাশ তাকাতে লাগল অরিন্দম।

'স্যুট পরে এসেছেন কেন ? বলাই তো আছে, পার্টিতে-অনুষ্ঠানে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসতে হবে—'

'তা, এখন কি সময় আছে ?' কণাদ ব্যস্ত হয়ে উঠল। পারলে পোশাক কেন গায়ের চামড়াও বুঝি সে ছুলে দেয়। অরিন্দমের হাত ধরে টান মারল হেঁচকা। বললে, 'চলো না, চেঞ্জ করে আসি। নিয়ম যখন আছে—'

কোমল হল রুচিরা। বললে, 'আপনি ফার্স্ট অফেণ্ডার, এ যাত্রা

এক্সকিউজ করা গেল। আপনি স্যাঙাত বলে আপনাকেও। কিন্তু, আগেই বলে রাখি বসতে চেয়ার পাবেন না।'

'না,' ওধার থেকে জগৎপতি উচ্ছ্বসিত হলেন ঃ 'ডেক-এ ঢালা ফরাস। সমান-তন্ত্র।'

'তাই সই। ট্রাউজার্স পরলে কী হয়, আমরা চাপটি খেয়েই বসব।' কণাদ বললে। ভাবখানা বোধ হয় এই আমরা সমস্ত দোকানের খদ্দের।

'তা আপনারা তো তৈরি।' এণাক্ষীকে লক্ষ্য করল অরিন্দম ঃ 'চলুন, আমার গাড়ি আছে, আমার গাড়িতে আমরা বেরিয়ে পড়ি।' রুচিরার গায়েও একবার বুলিয়ে নিল চাউনি।

এণাক্ষী দিব্যি ঠেলে দিল মেয়েকে। বললে, 'তুই যা।'

'চলুন।' কণাদকে আড়াল করে এগিয়ে এল অরিন্দম।

'আমাদেরও গাড়ি আছে।' পালটা বলে রুচিরা, খোঁচাটা প্রচ্ছন্ন থেকেও থাকল না বোধ হয়।

'তাতে আমি আর উনি যাব।' এণাক্ষী ছটফট করে উঠল ঃ 'ওঁর তো এখনো স্নানও হয়নি।'

'সে তো আমাদের বাড়ির গাড়ি।' রুচিরা বললে, 'আমি তার কথা বলছি না। আমাদের গাড়ি মানে স্টেশন ওয়াগন, যেটা শুভময় নিয়ে আসছে। যেটায় আমরা র‍্যাঙ্ক য়্যাণ্ড ফাইলরা যাব।'

'হ্যাঁ', মীমাংসার সুর আনলেন জগৎপতিঃ 'ও সেক্রেটারি, ওর কি আগে গেলে চলে ? ও পরে যাবে।'

'শেষে আয়োজনে কোনো ত্রুটি হলে আপনারাই অসন্তুষ্ট হবেন।' রুচিরা হাসল ঃ 'তারপর আজ যিনি নতুন লাইফ মেম্বর হচ্ছেন তাঁর কাছে যথাসম্ভব নিখুঁত করেই দেখানো দরকার।' তাকাল কণাদের দিকে ঃ 'কী বলেন, ঠিক বলিনি ?'

'ঠিক বলেছেন।' অরিন্দমের হাত ধরে টানল কণাদ। বললে, 'চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

দুজনে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় খুলে দিয়ে গেল গেটটা।

জগৎপতি বুঝি একটু এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, দেখলেন ভাস্কর, সেই প্রার্থী ছেলেটা তখনো ঘুরঘুর করছে।

'এ কি, যাননি এখনো ?' প্রায় ফেটে পড়লেন জগৎপতি।

'ভাবছি এখনো যদি দেন সার্টিফিকেটটা। সামান্য একটা কথা। তাতে আপনার কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি একটা চাকরি পেয়ে যাই।'

যেন একটা সাম্রাজ্য পেয়ে যাই এমনি করে বললে কথাটা।

'আপনাকে বলেছি না, আপনাকে চিনি না, আপনার সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না, তাই পারব না লিখতে।' ফিরে দাঁড়ালেন জগৎপতি : 'তখন থেকে কেন মিছামিছি বিরক্ত করছেন ? যান, আমার সময় নেই। আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।'

'জানি, আজ তরুণ-সমিতির স্টিমারপার্টি। আপনারা সবাই যাচ্ছেন। কিন্তু এক লাইন লিখে দিতে কতক্ষণ আর লাগে বলুন। আপনারা বড়লোক—আপনারা যদি—'

'বড়লোক মানে ?' যেন প্রচণ্ড একটা গাল খেয়েছেন এমনি জ্বলে উঠলেন জগৎপতি : 'বড়লোক হওয়া কি দোষের কথা ? আমি কি ইনহেরিট করে বড়লোক হয়েছি ? যা হয়েছি স্ট্রাগল করে হয়েছি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হয়েছি। কত বাধা-বিপদ-ব্যর্থতার সঙ্গে লড়াই করে, কত ধৈর্য কত অধ্যবসায়ের পাহাড় ডিঙিয়ে— তার আপনি কী জানেন। আপনি যে চাকরি করতে যাচ্ছেন তাও ক্রমে এই বড়লোক হবার জন্যে—'

'না, তা নয়, বলছিলাম, বড়লোক যখন, তখন হৃদয় কেন বড় হবে না ?'

'সেই হৃদয়ের বড়ত্ব প্রমাণ করতে হবে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে, বে-আইনি কাজ করে? মার্জনা করুন। আমার দ্বারা হবে না। আপনি যান।' জগৎপতি গেটের দিকে ডান হাতটা প্রসারিত করে দিলেন: 'পথ দেখুন।'

'আচ্ছা, আসি, নমস্কার।' করুণ মুখে নমস্কার করল ভাস্কর। জগৎপতি লক্ষ্য করলেন, ছুটি হাত ঠিক একত্রই করেছে ছেলেটা আর নাকে মুখে নয়, সম্পূর্ণ কপালে এনেই ঠেকিয়েছে। এবং পরাভূত, প্রত্যাখ্যাত হলেও ধীর পায়েই পেরিয়েছে গেটটা; আর, সব চেয়ে আশ্চর্য, পেরিয়ে গিয়ে হাট-করা গেটের দরজা ছুটো আস্তে টেনে খাঁজে খাঁজে লাগিয়ে বন্ধ করেছে।

ভাবখানা এমনি, যেন হেরে গেলেও পৃথিবীর উপর তার রাগ নেই।

কোথায় ফিরে আসবেন তক্ষুনি তা নয়, জগৎপতি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। এক মূহূর্ত ভাবলেন, ছেলেটাকে ডাকব নাকি।

কিন্তু তক্ষুনি ওয়াগন নিয়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ল শুভময়। হুড়মুড় করে গেট-ফেট ছত্রখান করে দিয়ে ভিতরে ঢুকল। লাফিয়ে উঠল দাওয়াতে: 'আপনারা রেডি?'

জগৎপতি বললেন, 'ওরা রেডি। আমি চানটা করে নিই।'

'কী দরকার। স্টিমারেই ফার্স্ট ক্লাশ বন্দোবস্ত আছে, সেখানেই চান করে নেবেন।' তারপর প্যাসেজটা পেরিয়ে আসতেই উথলে উঠল: বা, 'আপনারা তৈরি। তাড়ার আগেই তৈরি—এ যে আপনারা ইতিহাস সৃষ্টি করলেন—'

'না, তৈরি নয়।' এণাক্ষী বললেন, 'মোড়ের দোকান থেকে কিছু সাজা পান কিনে নিতে হবে।'

'দিন, কিনে আনছি।' শুভময় হাত পাতল: 'এ আর কতক্ষণ!'

ব্যাগ খুলে তার হাতে টাকা দিলেন এণাক্ষী। 'জর্দা আনবে কিন্তু।'

'আর আমাকে ঐ রক্তকরবীর গুচ্ছটা।' বাগানে গাছের দিকে চোখ ফেলল রুচিরা।

শুভময় পানের দোকানে অর্ডার দিয়ে ছুটতে-ছুটতে ফিরে এল। ফুলের গুচ্ছটা রুচিরাকে পেড়ে দিয়ে আবার ছুটল দোকানে।

পান নিয়ে এসে দেখল জগৎপতির শেভ হয়েছে বটে স্নান হয়নি। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে শুভময়কে বললেন, 'খান-কয়েক চেয়ার জোগাড় হবে তো হে?'

'চেয়ার? চেয়ার কেন?' ধাক্কা খেল শুভময়।

'অরিন্দম আর তার বন্ধু আসছে। দুজনেরই সাহেবি পোশাক। যখন এসেই পড়েছে এ পোশাকে তখন আর ওদের যন্ত্রণা দেওয়া কেন? বিশেষত,' হাসলেন জগৎপতি: 'বন্ধু যখন লাইফ মেম্বর হচ্ছেন—'

'লাইফ মেম্বর হচ্ছেন? তা, চেয়ার জোগাড় হবে বৈকি।' লাফিয়ে উঠল শুভময়।

'না। সমিতির নিয়ম ভাঙা চলবে না।' দৃঢ়স্বর রুচিরার: 'আমরা আইন করে আবার আমরাই যদি তা ভাঙি, তাহলে মানে হয় না কোনো।'

'যে বন্ধু আজ নতুন মেম্বর হচ্ছে সে তো জানে না সাত-পাঁচ।' বললেন জগৎপতি।

'কিন্তু আইন জানি না এ আইনের চোখে কোনো অজুহাত নয়।' দৃঢ়তর রুচিরা।

'বন্ধু না জানতে পারে কিন্তু অরিন্দম বাবু তো জানেন।' রুচিরার থেকে প্রেরণা নিয়ে বললে শুভময়, 'তিনি কেন অনুষ্ঠানে স্যুট পরে আসেন? চেয়ার ডিম্যাণ্ড করেন? তিনি তো আর নতুন নন।'

'আহা, বন্ধুর খাতিরে ঐ রকম পরে ফেলেছে। বিশেষ খেয়াল করেনি।' জগৎপতি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আর তার বন্ধু যদি চেয়ার পায় সে নিচে বসবে এটা দৃষ্টিকটু লাগে।'

'দুজনেই নিচে বসবে।' রুচিরার স্বর তপ্ততর।

'চেয়ার কখানা থাক না।' মিটমাটের সুরে বললেন এণাক্ষী, 'যার যখন খুশি কখনো নিচে বসবে কখনো বা চেয়ারে বসবে।'

'নিজের কথাটাই ভাবলে বুঝি।' স্ত্রীকে লক্ষ্য করে পরিহাস করলেন জগৎপতি।

'তোমার কথাটাও ভাবলাম।' পান মুখে হাসলেন এণাক্ষী।

শুভময় চেয়েছিল হাসতে কিন্তু রুচিরার মুখ দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। মুখে যাই বলুন, অন্তরে বড়লোকের প্রতিই বাবার টান বেশি, তার প্রতিবাদেই যে রুচিরার গাম্ভীর্য সেটা বুঝতে দেরি হল না। তাই জগৎপতিকে লক্ষ্য করে রুক্ষ স্বরে জিগগেস করলে, 'আপনার কি আরো দেরি হবে ?'

'হ্যাঁ, হবে একটু। তোমরা বেরিয়ে পড়। আমি বাড়ির গাড়িতেই যাব না-হয়।'

'আপনি ?' এণাক্ষীর দিকে তাকাল শুভময়।

'আমিও পরে যাব।'

'আর—' এবার রক্তকরবীর গুচ্ছের উপর চোখ রাখল।

'আমি যাব আমাদের গাড়িতে। সমিতির গাড়িতে।' খসা আঁচলটা শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে ওয়াগনে উঠল রুচিরা।

গাড়িভর্তি গুচ্ছের ছেলেমেয়ে কিলবিল খিলখিল করে উঠল।

একমাত্র মেয়ে। তারও চেয়ে বেশি—একমাত্র সন্তান। তারও চেয়ে বেশি—আশা যখন চলে যাচ্ছিল তখন এসেছে। এসেছে শেষ যৌবনে শেষ জোয়ারে।

তাই রুচিরা আদরের পিরামিড। সোহাগের পাহাড়-পর্বত।

প্রথম জীবনে সামান্য অবস্থায় জগৎপতি সুরু করেছিল। যাতে তাড়াতাড়ি হয় তারই জন্যে বি-এ পাশ করেই ল-তে ঢুকল। টায়েটুয়ে ল পাশ করেই, যাতে তাড়াতাড়ি হয়, চলল ফৌজদারিতে। চাল নেই চুলো নেই মুরুব্বি-মাতব্বর কেউ নেই, একমাত্র উচ্চাশাকে মূলধন করেই বসল বটতলায়।

দেখতে-দেখতে জমে গেল প্র্যাকটিস।

প্র্যাকটিস জমাতে কী লাগে? বিদ্যে নয় বুদ্ধি নয় বিত্তবেসাত নয়, একমাত্র অদৃষ্ট। শুধু লাঙল ঠেললে কী হবে যদি বৃষ্টি না ঝরে? আর বৃষ্টি যদি ঝরে, মাটিতে যদি একবার জল দাঁড়ায়, তাহলে এমনি একটা বীজ ছুঁড়ে দিলেই সোনা।

প্রথমেই একটা বলাৎকারের মামলা পায়। হতভাগা মামলা। তাতে উকিলের কী? সে মামলা পেলেই ভাগ্যমন্ত। তার কাজ মহৎ কাজ। দুঃস্থের সেবা। পীড়িতের উপশম। দোষী জেনেও আসামীকে খালাস করে আনা।

কোর্টে যাবার মুখে, ঠিক জায়গা বুঝেই, নবগ্রহের মন্দির। জগৎপতি থালায় পয়সা দিয়ে প্রণাম করে কপালে একটা সিঁদুরের ফোঁটা চড়াল। আর আসামীকে কাঠগড়া থেকে বেকসুর ছাড়িয়ে আনলে।

প্রমাণে পাওয়া গেল মেয়েটার আইনসিদ্ধ বয়স হয়েছে আর অভিযোগে যাকে ধর্ষণ বলা হচ্ছে তা আসলে প্রেমের উপঢৌকন।

জগৎপতির জয়জয়কার পড়ে গেল।

সকলে বললে, কপালে ওর ঐ সিঁছুরের ফোঁটাটাই তার সাফল্যের রহস্য।

তা কেন। কালক্রমে জগৎপতি যখন হাইকোর্টের খাতায় নাম লেখাল, সম্ভ্রান্ততম হল, তখন সে আর সিঁছুরের ফোঁটা দিত কই? দিত না। যে রুপার ফোঁটা পায় তার আর সিঁছুরের ফোঁটার দরকার হয় না।

কী কুৎসিত কষ্টেই না কেটেছে প্রথমটা। মানিকতলার ওদিকে একটা হাঁপধরা গলিতে দেড়খানা ঘর নিয়ে ছিল। বাজার-দর পড়ে যেতে পারে ভেবে ল পড়তে-পড়তেই বিয়েটা সেরে নিয়েছিল বুদ্ধি করে। নইলে একা থাকলেই মেসে থাকতে হত, আর মেসে থাকতে হলে বৈঠকখানা পেত কোথায়? মক্কেলের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলেই তো সর্বনাশ। তাহলে প্র্যাকটিসের কথা না ভেবে ভাবতে হত কেরানিগিরির কথা, নয়তো ইস্কুল-মাস্টারির। উচ্চাশার মুখে ছাই পড়ত। এ দিব্যি বউ হল বলে একটা ডেরা হল, ঠিকানা দেবার মত বৈঠকখানা হল। যদি কেউ কখনো আসে, এণাক্ষীকে আধখানা ফালি ঘরটাতে দাঁড় করিয়ে রেখে শোবার ঘরকেই বৈঠকখানা করে নেওয়া যায়। বসুন, বসুন. তাতে কী, বিছানার উপরেই বসুন। কথাটা সেরে নিতে কতক্ষণ। লোকে যাই বলুক, বৈঠকখানাতে কে কবে শোবার ঘরের স্পর্শ দিয়েছে!

দিনে-দিনে বছরে-বছরে জগৎপতির উন্নতি হতে লাগল। টাকা হওয়া মানেই উন্নতি হওয়া। আর, তখন তার মান শুধু ধনবান বলে নয়, সর্ববিদ্যায় জ্ঞানবান বলে। সর্বসভায় সে তখন বাঁধা শোভাপতি। সে হাসলেই তখন সেটা রসিকতা, মুখ গম্ভীর করলেই সেটা বিসদৃশ। টাকায় প্রবেশ করলেই তার তখন শিল্পে প্রবেশ, সাহিত্যে প্রবেশ, শাস্ত্রেপাণ্ডিত্যে পর্যন্ত অধিকার। সমাজের তখন সে একজন কর্তা-

ভর্তা লোক, বৈদগ্ধ্যের চূড়ামণি। তখন এমন কি সে সার্টিফিকেট দিতে উপযুক্ত।

'তুমিই আমার লক্ষ্মী।' এণাক্ষীকে গোড়ার দিকে বলেছিল একদিন জগৎপতি।

'লক্ষ্মী না তার বাহন!'

'কী যে বলো! তোমার জন্যেই তো আমার এ সাফল্য। নইলে, আমি কী ছিলাম- -

'কিন্তু আমার সাফল্য কোথায়?' মুখখানা বুঝি ছলছলে করেছিল এণাক্ষী: 'তুমি তো টাকা পাচ্ছ, মান পাচ্ছ, প্রশংসা পাচ্ছ, কিন্তু আমি কী পেলাম! আমি তো রিক্ত।'

হেসে উঠেছিল জগৎপতি। 'তাই তো তোমাকে লক্ষ্মী বলছি। এ লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, বাংলা দেশের লক্ষ্মী। তার মানে বেশ শান্ত, ঠাণ্ডা, সুবোধ মেয়ে।'

'বটে আর কি।' চোখের কোণে ইসারাকে সূক্ষ্ম করেছিল এণাক্ষী: 'বাংলা দেশের লক্ষ্মীদেরও ধন-রত্ন কিছু কম নয়।'

'সেইজন্যেই তো তোমাকে বাহবা দিচ্ছি। গোড়াতেই তুমি রত্নপ্রসূ হয়ে ওঠনি। তছনছ করনি সংসার। আমাকে একটু গুছিয়ে তোলবার সময় দিয়েছ।'

'সব তো আমারই দোষ।' অভিমানে মুখ মেঘলা করেছিল এণাক্ষী।

'আমি দোষ বললাম নাকি? গুণ, গুণ—তুমি আমার গুণের সাগর।' চিবুক ধরে একটু বা আদর করতে চেয়েছিল জগৎপতি: 'আমার নিশ্বাসের হাওয়া। নইলে তুমি যদি বছর-বছর হাসপাতালে চেঞ্জে যেতে, তাহলে আমি এত সব সামলাতাম কী করে? আমার প্র্যাকটিসই হত না।'

'কিন্তু শুধু প্র্যাকটিসে কী হবে? ব্যাঙ্ক ভরলেই কি আর ঘর ভরে?'

হঠাৎ প্রখর হয়ে উঠেছিল এনাক্ষী ঃ 'সব, সব তোমার দোষ।'

'আমার দোষ?' ছুটতে-ছুটতে বাস্ মিস করার মত মুখ করেছিল জগৎপতি।

'হ্যাঁ, তোমার। তোমার মন এককোঁটাও আমাব দিকে নয়, কেবল মোকদ্দমার দিকে। তোমার ফন্দিফিকির মামলা জেতার, আমাকে জেতার নয়। আমি নিতে চাইলেও তুমিই দিতে চাও না। তোমার মন নেই সংসারে।'

'আমার সংসারে মন নেই?' মন খুলে হেসে উঠেছিল জগৎপতি ঃ 'আমি কি সন্নেসি?'

'তোমার মন শুধু টাকায়। নামে। কী করে আঙুল ফুলে অশ্বত্থ গাছ হবে তার দিকে।'

'তার আগে কলাগাছটা হয়ে নিই।' আবাব হেসেছিল জগৎপতি।

'তোমার এত দিয়ে কী হবে? খাবে কে?'

'দাঁড়াও, সবুর করো। সবুরেই মেওয়া ফলবে। কাল পূর্ণ হলেই আসবে অকালকুষ্মাণ্ড।'

বাড়ি বদলাল জগৎপতি। একতলা ছেড়ে দোতলা বাড়ি নিল। নিচে বৈঠকখানা উপরে শোবার ঘর, ঠাকুর-চাকর টেলিফোন—দাঁড়াল পাকাপোক্ত মধ্যবিত্ততায়। অনেক আরাম-অবকাশ নিয়ে এল এণাক্ষীর জন্যে। সাজ-গোজ-গয়না, সিনেমা-থিয়েটার-জলসা, দরাজ হাতখরচ—কোনো কিছুই ত্রুটি রাখল না জগৎপতি। কিন্তু আসল ঘরেই মশাল নেই, শুধু ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া টাঙিয়ে কী হবে?

'আমি যদি আসামী হতাম তাহলেই বোধ হয় আমাতে তোমার আপ্রাণ আকর্ষণ হত।' তবু অভিযোগ যায় না এণাক্ষীর।

'আসামী হতে মানে?'

'আসামী হলে তুমি যে করে হোক আমাকে মুক্ত করে দিতে।'

'তুমি এখানে মুক্ত হতে চাইছ কোথায়? তুমি তো বন্ধ হতে চাইছ। যেতে চাইছ সলিটারি কনফাইনমেণ্টে।' আবার হাসির ঢেউ তুলল জগৎপতি।

বিয়ের প্রায় পনেরো বছর পর আগমনীর আভাস জাগল।

হাসি ফুটল এণাক্ষীর। হাসি শুধু মুখে নয় সর্বাঙ্গে। যন্ত্রণার মধ্যেও যে এত স্বপ্ন তা কে জানত। সবাই বললে, ছেলে হবে।

মেয়ে হল।

আর মেয়ে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আরো পসার বাড়ল জগৎপতির। গাড়ি হল। প্রথমে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, ক-মাস পরেই একটা আনকোরা আলিশান।

অনেক টাকা দিয়ে গ্যারেজওয়ালা বড় বাড়ি ভাড়া নিল। উর্দি হল ড্রাইভারের।

সব এখন মেয়ের দৌলতে। মেয়েই সাত রাজার ধন এক মানিক। সাত আকাশ-ছেঁচা এক চাঁদ।

খরচের ঢেউয়ে আদরের পানসি ভাসাল বাপ-মা।

মেয়ে যখন জন্মেছে তখন সেটা বড় লোকের ঘর; তাই, সন্দেহ কি, সে আদ্যোপান্ত বড়লোকের মেয়ে আর তার জন্মাবার উনিশ-কুড়ি বছর পরও যখন আর কেউ এল না, তখন, সন্দেহ কি, সে বড়-লোকের একমাত্র সন্তান।

রুচিরা যা চায় তাই পায়।

সাজগোজ প্রসাধন এ সব তো মামুলি কথা। বই-লাইব্রেরি-প্রফেসার এ সবও সেকেলে। খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ এতেই বা কী এমন নতুনত্ব। নাচবে গাইবে বা নাটক করবে এ তো গরিব মধ্য-বিত্তরাও করে। তারপর সাঁতার শেখা বা মোটর চালানো মোটেই দুরূহ ব্যাপার নয়, মাস খানেকের ওয়াস্তা। এতে আর সবিশেষ কী গুনপনার পরিচয়।

এ সবে রুচিরার মন ভরে না। এক দিকে তার বিষম অভাব। তার একটা জিনিস নেই। আর সেটাই আসল জিনিস।

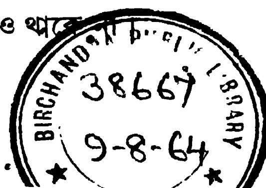
তার নাম স্বাধীনতা। তার স্বাধীনতা নেই।

নেই? না। অনেক কিছুই সে পায় বটে কিন্তু চেয়ে পায়। বাবা, ওটা আমার চাই, বলতে হয় মুখ ফুটে। বাবা যদি বোঝেন ওটায় সম্ভ্রমের হানি হবে না পাইয়ে দেন। দামের জন্যে ভাবেন না। মা, ওটা আমায় কিনে দাও, ওটা দেখতে বেশ, মিনতির স্থর আনতে হয় দস্তুরমত। আর্জি নিয়ে মা তখন পেশ করবেন বাবার কাছে। আর বাবার হিসেব মর্যাদার হিসেব। যদি বোঝেন ওতে আভিজাত্যের ক্ষতি হবে না, বৃদ্ধি হোক বা না হোক, বাবা প্রশ্রয়ে উদার হবেন।

কিন্তু যাই বলো, চাইতে হয়, আর চাওয়াটাই ঘেন্না। হোক না বা তা বাপের কাছে চাওয়া। হোক না বা তা ঈশ্বরের কাছে। চাইতে গেলেই নিজেকে কেমন ছোট-ছোট লাগে, কেমন গলার কাছে দলা পাকায়। যতই হাল্কা স্থরে খুশির ঢেউ তুলে চাওয়া যাক না কেন, কোত্থেকে একটা সন্দেহ না কুণ্ঠা না দ্বিধা এসে জোটে। কিংবা হয়তো বা নামঞ্জুরের ভয়।

নিজের বলে অনেক যদি টাকা থাকত রুচিরার! আর টাকা, টাকাই বুঝি স্বাধীনতা!

তার বাবার টাকা আছে, মারও হয়তো আছে, কিন্তু সেই কপর্দকশূন্য। সে হাতখরচ পায় না বলতে চাও? না, তা পায়, কিন্তু এক থোক ফুরিয়ে আরেক থোক চাইতে গেলেই বাবার কাছে হিসেব দিতে হয়। একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না হোক, অন্তত উপর-উপর। যে টাকার হিসেব দিতে হয়, সে কি আর টাকা? আর, সুখ তো সত্যি ধনে নয়, মনে। তাই যখন ভাবা যায় এ টাকা আমার নয় পরের, তখন আর আদর থাকে না বলে বুঝি দরও থাকে না।



কিন্তু টাকায় রুচিরার কী দরকার ? কোথাও যাবে ? বাবাকে বলুক না, নিখুঁত বন্দোবস্ত করে দেবে। কিছু কিনবে ? বাবাকে বলুক না, নিটোল কিনিয়ে দেবে। কাউকে দেবে, দান করবে ? বলুক না বাবাকে। পাত্র বা প্রতিষ্ঠান যদি জগৎপতির ব্যবসায় না প্রতিকূল হয় সে আপত্তি করবে না।

না, সব সময় বাবাকে বলতে হবে কেন ? পারব না বলতে।

নিজের বলে টাকা পেলে কী করত সে ? হয়ত কিছুই করত না। শুধু নিজের বলে, নিজস্ব বলে অনুভব করত।

বা, তা হলে বাবার বাড়ি-গাড়ি—দক্ষিণে নতুন বাড়ি উঠছে জগৎ-পতির—টাকা-পয়সা অস্থাবর মালামাল সবই তার, অমনি অনুভব করলে হয় ! অন্তত জগৎপতির তিরোধানে তো তাই হবে। প্রথমে একটা আট আনা প্রণামী পাবে বটে, কিন্তু এণাক্ষীর অবর্তমানে ষোল আনাই রুচিরার।

কিন্তু সে ষোল আনা অনুভব এখন এ মুহূর্তেই হবে কী করে ? যা হবে তা এক্ষুনি-এক্ষুনি হয় কই ? তাছাড়া কে কার আগে মরে তার ঠিক কী ?

বেশ তো, যা একদিন তার ষোল আনা হবে, তার এক চিলতে এখুনি তাকে লিখে-পড়ে দিয়ে দেওয়া যায় না ? সে তো আইনের চোখে এখন সাবালক হয়ে উঠেছে। সেই এক চিলতের সে নিরভি-ভাবক মালিক হতে পারে না ? যার সম্পর্কে কোনো জবাবদিহি থাকবে না কারু কাছে ? মুখ নিচু করে দিতে হবে না হিসেব-নিকেশ।

সে মেয়ে, বড় লোকের মেয়ে, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। অমন একটা চিলতে পেলে সে একটু স্বাধীনতা কিনত।

সে সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে উঠত, রিকশা চড়ত. ট্রেনে টিকিট কাটত থার্ড ক্লাশের। ফুচকা খেত, খেত বা ঘুগনিদানা। পান খেত, আলতা

পরত খালি পায়ে, কালীঘাট যেত, গঙ্গাস্নান করত। উনুনের সামনে বসে রাঁধত ডাল-ভাত।

তার সব আছে কিন্তু সাধারণ হবার আটপৌরে হবার স্বাধীনতা নেই। এমন কিছুই সে করতে পারে না যাতে তাকে গরিব-গরিব দেখায়। সাদামাঠা বলে মনে হয়।

যেহেতু তার যে-সব পরের ধনে পোদ্দারি। নিজের রোজগেরে টাকা হলে তাকে সাদাসিদে হতে কে বাধা দেয়?

তাই বি-এ পাশ করার পর জগৎপতিকে রুচিরা বললে, 'আমি এবার চাকরি করব।'

'চাকরির কোনো আশা নেই।' ঘরে ঢুকেই ভাস্কর বললে মাকে উদ্দেশ করে। মা পাশের ঘরে পূজায় মগ্ন, তারই জন্যে তাঁকে উঁচু গলায় শোনানো দরকার! 'কী করে হবে? মানী-গুণী ভদ্রলোক সামান্য এক লাইন সার্টিফিকেট দিতে নারাজ। এত অবিশ্বাস! তারপর যেখানেই যাবে সেখানেই মেয়েদের ভিড়।'

পূজার মধ্যেও মা দু'-একটা কথা না কন এমন নয়। জবাবের উদ্বেগ মনে পুষে না রেখে সোজা খোলসা করে দেওয়াই ভালো। কিন্তু এখন, এ মুহূর্তে মার কোনো সাড়া নেই। নেই বা একটু হতাশার দীর্ঘশ্বাস।

'দুঃস্থ মেয়ে নেই এ কথা বলছিনে।' আপনমনেই বলতে লাগল ভাস্কর: 'তারা আসে, আসুক। কিন্তু এমন অনেক মেয়ে আছে যারা বড়লোক, যাদের টাকা রোজগারের কোনো দরকার নেই। তারা চাকরি করতে চায় শুধু চালের জন্যে। আর তাদের মুরুব্বি যাকে বলে তারাই পেয়ে যায় সহজে।'

মহালয়ার তবুও সাড়াশব্দ নেই।

জুতো পায়েই পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল ভাস্কর। 'এই চাকরিটাও হল না, মা।'

পাশের ছোট ঘরের এক কোণে অল্প একটু জায়গা নিয়ে পূজায় বসেছে মহালয়া। সামনে ছোট জলচৌকির উপরে পিতলের সিংহাসনে ছোট একটি গোপাল।

'একটা না হয় আরেকটা হবে।' মহালয়া শান্তস্বরে বললে।

'ছাই হবে। তুমি ঐ ক্ষুদ্রকায় দেবতাটাকে ছাড়ো।' ভাস্কর বললে গম্ভীর হয়েঃ 'ওটা অপোগণ্ড শিশু, ওর কোনোই শক্তি নেই।'

মহালয়া বুঝি মনে মনে হাসল। বললে, 'ও গিরিগোবর্ধন ধরেছিল।'

'মুণ্ডু ধরেছিল। দেখ কী নির্লজ্জ, আমরাই খেতে পাচ্ছি না, আর ও কেমন হাত বাড়িয়ে আমাদের কাছেই ভিক্ষে চাইছে। ওটাকে ফেলে দাও মা, তার চেয়ে বরং হনুমানকে ধরো।'

মহালয়া কথা কইল না।

'হনুমান পাহাড় শুধু মাথায় ধরেনি, বয়ে নিয়ে এসেছিল লঙ্কায়। মরা লক্ষ্মণকে বাঁচিয়েছিল ওষুধ দিয়ে।'

তন্ময়তার মধ্য থেকেই বললে মহালয়া, 'তুই-ই তো আমার মহাবীর।'

নতুন অঞ্চলে তেতলা বাড়ি তুললেন জগৎপতি।

প্রথমে ভেবেছিলেন একতলাটা ভাড়া দেবেন, নিজেরা থাকবেন উপরে। কিন্তু ঠিক সময়েই, ধনী হবার পর মোটা হয়েছে এণাক্ষী, হৃৎ-পিণ্ডে চাঞ্চল্য ঘটাল। ডাক্তার বললে, ওঠা-নামা যত কম করা যায়। তাছাড়া মক্কেলরা হন-হন করে ঢুকে পড়তে ব্যস্ত, সিঁড়ি ভাঙতে গেলেই দেরি করবে তারা, দ্বিধায় পড়বে। ধনাগমের পথ দ্রুত ও সমতল রাখাই বাঞ্ছনীয়। তাই ছাড়া যাবে না একতলা।

কিন্তু তিনটি তো মোটে প্রাণী—এত-এত ঘর তারা ভরবে কী দিয়ে? ঠিক করলে, তেতলাটা ভাড়া দিই।

কিন্তু যাকে-তাকে দেওয়া যায় না। এমন লোককে দিতে হয় যাতে বাড়িটার জাত থাকে। ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্ট অনেকদিন থেকে লেখালেখি করছে। তাদের এক পাঞ্জাবী অফিসরের সমূহ একটা ফ্ল্যাট দরকার। কোনো ঝামেলা নেই সজ্জন সিং-এর। সে একলা, অখণ্ডিত। বিয়ে করেনি এখনো। আর ভাড়া যা দেবে সরকার তা ন্যায্যের চেয়েও বেশি। আর আদায়ে কোনো ঝঞ্ঝাট নেই বাড়িওলার। আদায় নিশ্চিত ও অনায়াস।

সজ্জন সিং মুকুটের মণি হয়ে বসল মাথার উপর।

মাঝে মাঝে রাস্তায় একা-একা এসে দাঁড়ান জগৎপতি। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। এ কি তাঁর বাড়ি? অবিবাদী স্বত্বের উপর দাঁড়িয়েছে ভিত্তি করে? এ কি তাঁরই ইট-পাথরের স্বপ্ন? কী করে এ সম্ভব হল? কোত্থেকে উঠল গজিয়ে? কে দিল? কেন দিল? না কি আবার একদিন কেড়ে নিয়ে যাবে? ধুলো করে ফেলবে? যেমন ফাঁকা ছিল তেমনি ফাঁকা করে দেবে সমস্ত?

তা কেন ? মনে মনে হাসলেন জগৎপতি। যখন একবার দিতে শুরু করেছে অঢেল করেই দেবে। না দিলে চলবে কেন ? আমিই বা ছাড়ব কোন বুদ্ধিতে ? আমি কি দুর্বল, না অধম ?

যখন উঠতে সুরু করেছি, আরো উঠব। বাড়িতে-গাড়িতে উঠেছি, নামেধামে উঠেছি, এবার উঠব শক্তিতে।

আর শক্তি মানেই রাজশক্তি।

হাইকোর্টের জজ করে দেবার কথা উঠেছিল। প্রত্যেক নিয়োগেই একটা-না একটা প্রতিবাদ ওঠে, জগৎপতির বেলায়ও ব্যতিক্রম হল না। বলা হল, জগৎপতি ফৌজদারিতেই রপ্ত, দেওয়ানির ক-খ-গও জানে না। জজ হলে কিছু জানতে লাগে নাকি ? পাল্টা বলে এপক্ষ। উকিল জজ হলে তো তার আইনের লাইব্রেরি বেচে দেয়, বেচে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু তা নয়, জগৎপতি নিজেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। জজের মধ্যে জৌলুস কোথায় ? গাড়িতে পাশে আর্দালি নিয়ে না এলে তাকে চেনে কে ? আর মাইনেই বা কত, এবং কত দিন ? উকিল হিসেবে জগৎপতির রোজগার অনেক বেশি আর ইহজগতে তার কোনোদিন রিটায়ারমেণ্ট নেই। স্ট্রেচারে করে উঠে শুয়ে-বসে শেষ দিন পর্যন্ত সে হেদিয়ে যাবে আর রক্ত উঠে মরে গেলে লোকে বলবে, দেখ, লোকটা কেমন জিন-লাগাম-যুক্ত ঘোড়ার মত মরেছে।

না, শুধু টাকায় সুখ নেই। ভোগ নেই। আসল সুখভোগ শক্তিতে। আর শক্তি মানে হিত করার শক্তি নয়, অনিষ্ট করার শক্তি। যার যত অনিষ্ট করার শক্তি তারই তত সম্মান, তত অভিনন্দন। আর শাসন করার অস্ত্র হাতে না থাকলে অনিষ্ট করি কি করে ? আর শাসন করার চূড়ান্ত অস্ত্র মন্ত্রীত্বে।

মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন জগৎপতি।

ভাবছেন রাজনীতিতে ঢুকবেন। আর তো জেলে যাওয়া নেই, এখন শুধু টাকার খেলা। টাকা দিয়ে, টাকা দেখিয়েই কিনবেন

নমিনেশন। তারপরে ভোট। মনেমনে হাসলেন জগৎপতি। হ্যাঁ, তার জন্যে কিছু মাটি তৈরি করতে হবে বৈকি। দরিদ্রের বন্ধু সাজতে হবে। তার মানে এখানে-ওখানে কিছু চাঁদা দিতে হবে মুক্তহস্তে। নিতে হবে জনপ্রিয়তার দীক্ষা। আর যে যা বলে সকলের মতে ঘাড় কাত করে নির্বিবাদ সায় দিয়ে যাওয়ার নামই জনপ্রিয়তা। আরো একটা বড় কথা, হতে হবে প্রগতিবাদী। এ আবার হতে হবে কী! বড়লোক হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তো আপনা থেকে হয়ে গিয়েছে। প্রগতির প্রত্যক্ষ উদাহরণই তো রুচিরা। তার সাজ-গোজ লেখা-পড়া চলা-ফেরা, ইংরিজি-বাঙলা উচ্চারণের কথা ছেড়ে দিই, মাঠে-ময়দানে তার দাপা-দাপি ছুটোছুটিও ধর্তব্য নয়, এত-র উপরে তার আবার নাচ-গান-অভিনয় দেখ। আর কে না জানে, হালের অভিধানে নাচ-গান-অভিনয়ই সংস্কৃতির নামান্তর। আর যা সংস্কৃতি তা-ই প্রগতি।

সেদিন কোথায় বেরুচ্ছে রুচিরা, পোশাক দেখে জগৎপতি থমকে গেলেন। বলে উঠলেন ঃ 'এ কী! হাত গলা কান সব খালি কেন?'

রুচিরা মৃদু হেসে বললে; 'এটাই প্রোগ্রেসিভ।'

'কোনটা?' মেয়ের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলতে জানেন জগৎপতি।

'এই নিরলঙ্কার থাকা।' কথাটা শক্ত হয়ে গেল বুঝে রুচিরা নিজেই সেটা নিরলঙ্কার করল ঃ 'মানে সরল সাদামাঠা থাকা—'

'বুঝেছি। যাকে বলে গরিব-গরিব দেখানো।' জগৎপতি হাসলেন। 'কি, গাড়িতে যাচ্ছিস তো?'

'হ্যাঁ, বাবা

'তার মানেই তাই। কারুকার্য যাই থাক, আসল ঠিক থাকলেই হল।' এবার জগৎপতি তাঁর হাসিতে একটু কুটিলতা মেশালেন ঃ 'গরিব হওয়া নয়, গরিব-গরিব দেখানো।'

'বেশি দেখাতে গেলে লোকে আবার কৃপণ না ভাবে।'

'হ্যাঁ, সেটা আবার লক্ষ্য রাখতে হবে। কৃপণ-কৃপণ না দেখানো।' কথাটা কী রকম হয়ে গেল দেখে শব্দ করে হাসলেন জগৎপতি : 'কৃপণ কখনো জনপ্রিয় হয় না। জনপ্রিয় হওয়াটাই প্রগ্রেসিভনেস। যাচ্ছ যে, একা যাচ্ছ ?'

'না, কলেজের কটা মেয়েকে তুলে নেব।'

'খুব ভালো। সকলের সঙ্গে মিশে পাঁচজনের একজন হয়ে গিয়ে আবার নিজের কোটে একলাটি হয়ে ফিরে আসা। এটাই বোধহয় বাঁচবার আর্ট।'

খুব একটা ত্বরার ভাব ফুটিয়ে রুচিরা বললে, 'এ বেলা তোমার গাড়ি লাগবে ?'

'না। কতক্ষণ দেরি হবে তোমার ?'

'এই ঘণ্টা দু-তিন।'

কোথায় যাচ্ছে জিগগেস করাটা অবান্তর, অনাধুনিক, তাই জগৎ-পতি সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'এস।'

তারপরে গেলেন এণাক্ষীর কাছে। 'তুমি একবার পাড়াটা ঘুরে এস।'

'ও আমি পারব না।'

'সে কী, নতুন বাড়ি করে এসেছ এ পাড়ায়, সবার সঙ্গে ভাব করতে হয়।'

'তুমি করো গে।'

'আমি তো গেছি এ-বাড়ি ও-বাড়ি। আপনাদের কাছাকাছি এলাম—নমস্কার করে বলতেই সকলে সৌজন্যে একেবারে বিগলিত হল। কী অমায়িক, কী নিরহঙ্কার, পরস্পর বলাবলিও কানে এল।' সমস্ত মুখে তৃপ্তি মেখে তাকালেন জগৎপতি : 'যাও না, তুমিও বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বিনয় দেখিয়ে এস না। দেখবে গিন্নির দল কেমন তোমাকে মাথায় করে রাখবে।'

'আমার বয়ে গেছে।' একবাক্যে নাকচ করে দিল এণাক্ষীঃ 'কিছুর মধ্যে কিছু না, আমি বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াই—পাগলের মত!'

'পাগলের মত হবে কেন, ঘোর বুদ্ধিমানের মত।' গম্ভীর হলেন জগৎপতি ঃ 'ওটাই হচ্ছে জনপ্রিয় হবার সহজ উপায়। আর জনপ্রিয় না হলে ইলেকশানে জিতব কী করে?'

বিদ্রূপের হাসি হাসল এণাক্ষী। বললে, 'এ যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আগে ইলেকশান আসুক। তখন দেখা যাবে। তখন না হয় ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে গিয়ে দাঁড়াব।'

'সেই দাঁড়ানোটা যাতে সড়গড় হয় তারই অভ্যেস আগে থেকে করে রাখা ভালো। মাটি পাট করে না রাখলে ফলন ভালো হয় কী করে?'

'রাখো। ঘোড়ার দেখা নেই আগেই চাবুকের ধুম।' হঠাৎ ভঙ্গিটা মোলায়েম করল এণাক্ষী ঃ 'দেখবে ওরাই আসবে আগে আগে।'

'তা আসুন, কিন্তু ভয় হয়, বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমাকে অহঙ্কারী বলবে। কিন্তু আগে-ভাগে তুমি যদি যাও নিজের থেকে, আর দেখতে হবে না, জয় পড়ে যাবে চারদিকে।'

'দরকার নেই। অমন ফাঁকা জয়ধ্বনি আমি চাই না।' ঘুরে দাঁড়াল এণাক্ষী ঃ 'তার চেয়ে, অহঙ্কারী বলুক, তা অনেক ভালো।'

'বলো কী, শুধু-শুধু লোকের পীড়ার কারণ হবে?'

'শুধু শুধু লোকে যদি পীড়িত হয়, আমি কী করতে পারি?' সরল-শান্ত মুখ করল এণাক্ষী ঃ 'ভগবান যদি আমাকে ঐশ্বর্য দেন, আমার কী উপায় আছে? জিনিস বেশি হলেই জিনিস উঁচু হবে। আর উঁচু হওয়া মানেই তো উদ্ধত হওয়া নয়। এই যদি লোকে বলে—'

'না, লোককে বলতে দেওয়া নয় কিছুতেই। আচ্ছা, বেশ,' মীমাংসার সুর ভাঁজল জগৎপতি ঃ 'আমি গিয়েছি, তুমি হঠাৎ এখুনি না গেলে। কিন্তু ভদ্রমহিলারা যদি আসেন কেউ বেড়াতে, তোমার

সঙ্গে পরিচিত হতে, ভীষণ আপ্যায়িত করবে, অমানীকে মান দেবে অকাতরে—’

‘সে আর তোমাকে বলতে হবে না।’ এণাক্ষী হাসল : ‘তবে দয়া করে জানিয়ে দিও যেন কেউ দুপুরবেলা না জ্বালায়। কত তপস্যা করে এই দুপুরের ঘুমটুকু আদায় করেছি, তা যেন পণ্ড না হয়।’

কণ্ঠে জগৎপতিও তারল্য আনলেন : ‘‘কুকুর থেকে সাবধান’ লোকে যেমন নোটিশ টাঙিয়ে রাখে তুমি তেমনি নোটিশ টাঙিয়ে রাখ—নাসিকাগর্জন থেকে সাবধান।’

কিন্তু প্রথমেই যে এল সে শুভময়। সঙ্গে আরো দুটি যুবক।

সরাসরি ঢুকে পড়ার দরুন একটু বোধহয় চমকালেন জগৎপতি। কিন্তু ভুল করলেন না, দিলেন না ভুল হতে। বললেন, ‘বসুন।’

চিড়বিড় করে উঠল ছেলেগুলি। শুভময় বললে, ‘আমাদের আপনি বলছেন কী—আমরা কত ছোট—’

‘না, না, ছোট-বড় কী! ছোট-বড় বলে কেউ নেই। গণতন্ত্রে আমরা সকলে সমান!’

‘সেদিক থেকে বলতে গেলে অবশ্যি ঠিক কথাই, তবে সাধারণ সামাজিক ক্ষেত্রে—’ শুভময় কথাটা শেষ করতে পারল না।

‘দেখুন যতদিন আপনি-তুমি-তুই চলবে ততদিন গণতন্ত্র নিরর্থক। গণতন্ত্রে ভাষারও সংস্কার হওয়া দরকার। এমন বাক্য ও ব্যাকরণ রাখা উচিত নয়, যা থেকে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে তারতম্যের সূচনা হয়।’

সঙ্গের আর দুটো ছেলে তো চুপ করেই রইল, শুভময় কান চুলকোতে চুলকোতে বললে, ‘তা, আপনি যা বলছেন—কিন্তু, আমাদের বক্তব্যটা খুব ছোট।’

‘ছোট হয়, নাই বা বসলেন তবে।’ জগৎপতি বন্ধ করলেন বক্তৃতা। সহৃদয় সশ্রদ্ধ চোখে তাকালেন : ‘বলুন কী চাই?’

‘[redacted]তী পুজোর চাঁদা।’

পুজো ? ঝাঁজ নিয়ে মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে আসছিল কথাটা, তাড়াতাড়ি গিলে ফেললেন জগৎপতি। পূজারীর চেহারা ও পোশাক এক পলকেই দেখলেন একটু খুঁটিয়ে। পরনে প্যান্ট, গায়ে হাতা-গুটোনো শার্ট, বুকের সবগুলো বোতাম খোলা। বোতাম একটাও নেই বলতে চাও? না, সবগুলো বোতামই আছে কিন্তু একটাও ঘরে আবদ্ধ নয়। জামার বুক খুলে রাখাই শুভময়ের বৈশিষ্ট্য।

'পুজো করেন বুঝি আপনারা?' একটুও যেন ব্যঙ্গ না ফোটে সতর্ক থাকলেন জগৎপতি।

'বুঝতেই পারেন—' একটু বা কাঁচুমাচু মুখ করল শুভময়ঃ পুজোটা উপলক্ষ্য মাত্র, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎসব!'

'ঠিকই তো। তাই তো দরকার। উৎসব না থাকলে পুজো কী?' রসিদ-বইয়ের জন্যে হাত বাড়ালেন জগৎপতি ঃ 'কত দিতে হবে?'

বাইরে থেকে মহড়া দিয়ে এসেছে বোধহয়, শুভময় আর তার বন্ধুরা একসঙ্গে বলে উঠল ঃ 'দশ টাকা।'

রসিদ-বইটা দেখতে লাগলেন জগৎপতি। সপ্রশংস স্বরে বলে উঠলেন ঃ 'বাঃ, চমৎকার নাম তো সমিতির!'

'আপনি ভালো বলছেন? সবাই ঠাট্টা করে, বলে, বুড়ো হয়ে গেলেও, চুল-দাড়ি পাকলেও তরুণ থাকবে।'

'তাই তে চাই। চিত্তে তরুণ, রক্তে তরুণ।' তরুণের দৃষ্টিতে ভাবলেন জগৎপতি ঃ 'তা ছাড়া এ তো কোনো ব্যক্তি নয়, এ সমিতি। তরুণ-সমিতি। মেম্বররা আসবে যাবে, বুড়ো হবে, কিন্তু সমিতি যে-তরুণ সেই তরুণ।'

'ঐ যে কী না জানি বলে কথাটা—মেন মে কাম য়্যাণ্ড মেন মে গো'—সমিতির পিছনের দিকের ছেলেটা বাকি কথাটা মনে করতে না পেরে বাঙলায় সারল ঃ 'কিন্তু আমি ঠিক আছি।'

'বাট, আই গো অন ফর এভার।' জগৎপতি পাদপূরণ করে দিলেন। রসিদ-বইয়ের শূন্য স্থানও পূরণ করলেন স্বহস্তে।

'ভুল লেখেন নি তো স্যার ?' শুভময় নম্রমুখে বললে।

'ভুল ? ভুল করতে যাব কেন ?' টেবিলের ড্রয়ার টানলেন জগৎপতি।

'একটা শূন্য বেশি দেন নি তো ?'

'কই ? দেখি না, ঠিক আছে। একশোই দিচ্ছি তোমাদের।' টানা খুলে জগৎপতি একটা একশো টাকার নোট কুড়িয়ে নিয়ে দিয়ে দিলেন অনায়াসে।

'একশো !' প্রায় একটা জয় দিয়ে ওঠবার মত উদ্দীপ্ত ভঙ্গি করল শুভময়। লোকে চা'র আনা—আট আনা দেয়, বড়জোর এক টাকা —ইনি না হয় দু টাকা দেবেন, খুব বেশি হলে পাঁচ টাকা—কিন্তু এ যে পূজাতীত প্রসাদ ! অতি-উৎসাহে শুভময় জগৎপতির পায়ের ধুলো নিয়ে বসল। গদ্গদস্বরে বললে, 'যাবেন কিন্তু।'

বিসর্জনের পরের দিন জলসা।

সমিতির সেক্রেটারি, শুভময় ও আরো কটা ছেলে এসেছে জগৎপতির কাছে। 'আপনাকে স্যার সভাপতি হতে হবে।

তা জগৎপতি জানেন। নইলে এক-মুষ্টিতে অতগুলো টাকা দেবার মানে কী ? তবু একেবারে শস্তা না দেখায় তাই বললেন, উদাসীনের মত, 'আমার সময় কোথায় ?'

'তা আমাদের জন্যে একটু সেক্রিফাইস করবেন, স্যার।' শুভময় এমনভাবে বললে যেন সময়কালে ওরাও অনেক করবে জগৎপতির জন্যে, অনেক খাটবে-পিটবে, অনেক সময় ও শ্রম দেবে অকাতরে। 'তা ছাড়া আমি এসব বুঝি কী—'

'কী যে বলেন স্যার। তাছাড়া, কী বলব, আপনি তো সবই জানেন, আজকাল কি কিছু বুঝতে লাগে ?'

'তবু যে-বিষয়ে যার নাম-ডাক—আর কাউকে ডাকুন।' অন্য-মনস্ক হতে চাইলেন জগৎপতি।

'আপনার নাম-ডাক কি কম? আমাদের পাড়ায় মনীষী থাকতে আমরা অন্যত্র যাব কেন?'

'তোমরা পাড়ার ছেলে—তোমরা যখন বলছ।' অগত্যা রাজি হলেন জগৎপতি।

'বাড়ির সবাইকে নিয়ে যাবেন। আমি কার্ড দিয়ে যাব।'

বাড়ির সবার দিকে তা হলে নজর পড়েছে সমিতির। জগৎপতি হাসলেন মনে-মনে। কিন্তু পরিপূর্ণ পড়েনি। নচেৎ পাড়ায় জলসা হচ্ছে অথচ তাতে রুচিরা নেই এটা আর যাই হোক, সংস্কৃতি নয়।

জলসায় গিয়ে জগৎপতি এক বিষম কাণ্ড করে বসলেন। একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, তাতে তিনি বসেছিলেন আর তাঁরই সঙ্গে সংযুক্ত বলে এণাক্ষী আর রুচিরা। আরো কে-কে বসেছিলেন সেটা লক্ষ্যের ছিল না। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বললেন, গণতন্ত্রে মঞ্চের প্রয়োজন নেই, কে কার থেকে উঁচু যে উচ্চাসনে বসবে, সব শ্রেণীহীন সমতলতায় মিশে যাবে একত্র হয়ে। তবে যদি বলেন, দর্শকের সুবিধের জন্যে একটা মঞ্চ দরকার, তা হলে তাতে তারাই বসবে যারা অংশ নিয়েছে জলসাতে; যারা অবান্তর, যারা আগন্তুক, তারা শুধু তাদের পদ-মর্যাদা বা অন্য মর্যাদার বলে মঞ্চাধিকার করে থাকবে এ অসম্ভব। দস্তুরমতো রুচিরার দিকে তাকালেন জগৎপতি। বললেন, আমি সভাপতি বলে মঞ্চস্থ হয়েছি, কিন্তু আমার বাড়ির মেয়েরা কোন অধিকারে বসবেন বেদীতে? তাঁরা তো সভার কেউ নন, তাঁরা সাধারণ দর্শকমাত্র। তাঁদের স্থান জনগণের মাঝখানে। আর, মঞ্চ থেকে নেমে গেলে আমিও তাঁদেরই পাশে—

চারদিক থেকে দারুণ হাততালি পড়ল। থামতে চায় না।

সহজে। এ একেবারে জননেতার মত কথা। মহানুভবের আহ্বান।

এণাক্ষী আর রুচিরা নেমে গেল স্টেজ থেকে। মাটিতে মেয়েদের এলেকায় গিয়ে বসল। বাড়ি ফিরে এণাক্ষী বিরক্ত মুখে বললে, 'খুব স্টান্ট দিলে যা হোক।'

'কিন্তু কী রকম নিলুম একহাত!' নিশ্বাসে বুক ভরে নিয়ে পরিতৃপ্ত মুখে বললেন জগৎপতি: 'জনপ্রিয়তার মই ধরে উঠে গেলুম কয়েক ধাপ। কী, বলো, উঠলুম কিনা। তোমরা যদি সাহায্য করো—'

'কিন্তু যাই বলো, ছেলেটা ভালো।'

'কোন ছেলেটা?'

'ক্লাবের যে সেক্রেটারি। শুভময়।'

'কেন, কী করেছে?'

'আমাকে একটা চেয়ার দিয়েছে বসতে। বললে, জনগণের মধ্যেও যাঁরা মানী-গুণী তাঁরা বিশেষ আসন পায় বৈ কি। নিন, বসুন। বলে কোণের দিকে, একটা চেয়ার পাতলে আমার জন্যে।'

'তোমার মোটেই চেয়ারে গিয়ে বসা উচিত হয়নি।' রুচিরা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'আমাকেও দিতে চেয়েছিল একটা, আমি রিফিউজ করে দিয়েছি। গোড়াতেই আমার নিচে মাটিতে বসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাবাই ডেকে নিলেন স্টেজের উপরে—'

হো হো করে হেসে উঠলেন জগৎপতি। 'ঐ, ঐ স্টান্টটার জন্যে। কিন্তু,' এণাক্ষীকে লক্ষ্য করলেন: 'শুভময় বেশ বিবেচক ছেলে তো! চেয়ার এনে দিয়েছে। তাছাড়া, যাই বলো, গঠনশক্তি আছে ছেলেটার! কী রকম করে-কম্মে তুলেছে ব্যাপারখানা! করে কী ছেলেটা? চাকরি-বাকরি আছে কিছু?'

'কে জানে!' ঠোঁট ওলটালো এণাক্ষী। মানে, করলে কত টাকার বা করে, এমনি উপেক্ষা।

'অবস্থা না জানি কী রকম?'

'পায়ে যখন স্যাণ্ডেল তখন নিশ্চয়ই ভালো নয়।' রায় দিল এণাক্ষী।

'লেখাপড়াই বা কদ্দূর ?'

'বেশিদূর নয়।' এণাক্ষী মুখচোখ গম্ভীর করল ঃ 'বেশিদূর হলে কি জামার বুকের বোতামগুলো খোলা রাখে ?'

হেসে উঠলেন জগৎপতি। বললেন, 'ওটা বোধহয় স্মার্টনেসের চেহারা। মানে, এত দ্রুত, যে জামার বোতাম লাগাবার সময় নেই।'

'হ্যাঁ, ঐ চেহারাটাই চকচকে।'

একটা লোককে বিচার করবার কী সব বুর্জোয়া স্ট্যাণ্ডার্ড ! মনে মনে রুষ্ট হল রুচিরা। বললে, 'অলস গবেষণা না করে ভদ্রলোককে সরাসরি ডেকে জিগগেস করলেই হয় !'

ডাকতে হল না, ফাঁকা বুঝে নিজের থেকেই হাজির শুভময়। 'একদিন আমাদের সমিতিতে চলুন, দেখে আসুন স্বচক্ষে।'

'এই যে—' উচ্ছ্বসিত হলেন জগৎপতি ঃ 'আসুন, বসুন।'

'আপনি যদি এখনো আপনি বলেন তাহলে তো মুস্কিল।' দাঁড়িয়ে রইল শুভময়।

'গণতন্ত্রের যুগ—আপনি না বললেই অপমান। কিন্তু যাই বলো,' নিজেকেই নিজে সংশোধন করলেন জগৎপতি ঃ 'বাঙলা ভাষায় আপনি-তুমি-তুই একটা আশ্চর্য চারুকলা। গণতন্ত্রের লোক মন-তন্ত্রে এসে গেলেই আপনি তুমি হয়ে ওঠে।'

'তবে?' প্রায় জয়ীর মত তাকাল শুভময়।

'বোসো হে বোসো।' সপ্রশংস দৃষ্টি তুলে তাকালেন জগৎপতি। বললেন, 'তোমার চমৎকার গঠনশক্তি। ফাংশানটা কী অপূর্ব, সুপার্বলি সাকসেসফুল করে তুললে। কত বয়েস হবে তোমার? ত্রিশ-বত্রিশ?'

'কাছাকাছি।' ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করল শুভময়। দৃঢ় করল কণ্ঠস্বর। বললে, 'এই গঠনশক্তির গুণেই তো গত ইলেকশানে জিতিয়ে দিলাম বিনয়দাকে।'

একটু বুঝি বা চিন্তিত হলেন জগৎপতি। ইলেকশানে দাঁড়াতে হলে তাঁকেও দাদা হতে হবে। এসব অর্বাচীনের দল তাঁকে জগৎদা বলে ডাকবে। উপায় নেই। দাদার জোরেই কুস্তি করা।

'কিন্তু দেখুন ইলেকশানে জেতার পর বিনয়দার আর দেখা নেই। তখন কত কী বলেছিলেন আমাদের সমিতির জন্যে হ্যানো করবেন ত্যানো করবেন। এখন সব ফক্কা।' আস্তিন গুটোলো শুভময়ঃ 'আমরাও দেখে নেব। এক মাঘে শীত পালায় না। যাই বলুন, ইলেকশানের ক্যাণ্ডিডেটকে বিশ্বাস করতে নেই।'

'না, না, লোক বুঝে বিশ্বাস করবে বৈকি।' পরামর্শদাতা-উকিলের ভঙ্গি করলেন জগৎপতি ঃ 'তবে আগে কড়ি পিছে বড়ি। দাম আদায় করে নিয়ে পরে কাজ দিতে হয়। যাক গে, গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন বলো', উদার প্রশ্রয়ে হাসলেন জগৎপতি ঃ 'তুমি কী করো ?'

'এই ডোবালেন।' শুভময়ও হাসল। বললে, 'করি মানে সমিতি করি, ভলানটিয়ারি করি।' যেন এটা একটা প্রকাণ্ড করা এমনি গর্বের ভাব করল শুভময় ঃ 'বলতে পারেন রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটাই।'

'না, আমি বলছি, কোনো আফিসে চাকরি-বাকরি করো কিনা।'

'তা একটা করতে হয়। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে যৎসামান্য মেকানিকের চাকরি।'

'কিছু মনে কোরো না। মাইনে ?'

'অতি দরিদ্র। বাবার বন্ধুর ফার্ম, গোড়াতে খুব আশ্বাস দিয়েছিলেন, উন্নতির চূড়ায় এনে তুলবেন, এমনকি বিলেত পাঠাবেন ট্রেনিং দিয়ে—'

'সে সব হলনা বুঝি ?'

'কী করে হবে ? গোটা দুই স্ট্রাইক অর্গানাইজ করতে হল যে।' ঢোঁক গিলল শুভময় ঃ 'কিন্তু আফিসে উন্নতি হল না বলে আমি আমার উচ্চাশা ছাড়িনি।'

'উচ্চাশা—কতদূর উচ্চ ?'

'মন্ত্রীর গদি পর্যন্ত।' এতটুকু ভড়কালনা শুভময়।

'মন্ত্রী ?' জগৎপতি স্তম্ভের মত হয়ে গেলেন। তার অর্থ, আগামী নির্বাচনে তাঁকে একটা লোফারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য হচ্ছেন কী!' তরল স্রোতে হাসল শুভময় ঃ 'সবচেয়ে সোজা। সবচেয়ে শস্তা এই মন্ত্রী হওয়া।'

'বলো কী ?' একটু বুঝি বা গম্ভীর হলেন জগৎপতি ঃ 'তোমার পড়াশোনা কদ্দূর ?'

'কেন, পড়াশোনা লাগে নাকি ? বিনয়দা, যাঁকে রিটার্ন করিয়ে দিলাম তিনি তো আই-এ ফেল।'

'আর তুমি ?'

'বাবা মারা গেলেন, আমার আর বি-এস-সি পরীক্ষা দেওয়া হল না।'

'তার মানে ?'

'তার মানে তাই। হ্যাঁ, চলতি বাঙলায় বলতে পারেন বি-এ ফেল। যারা ফেল করে তাদের পরীক্ষা দেওয়া হয় না। যারা প্লেস কিংবা ডিভিশন পায় না তারা সব সময়ই দু নম্বরের জন্যে মিস করে।' হাসির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল শুভময়ঃ 'কিছু না, কিছু না, কিস্‌সু লাগেনা মন্ত্রী হতে।'

'কিছু না ?' প্রায় হতাশের মত মুখ করলেন জগৎপতি।

'অন্তত লেখাপড়া না। বরং লেখাপড়াটা মন্ত্রীত্বের পক্ষে হ্যাণ্ডি-ক্যাপ। রাজনীতির পক্ষে ডিসট্র্যাকশান। যে হোলটাইমার পলিটি-শিয়্যান সে লেখাপড়া করবে কী! লেখাপড়া করলেই তো বিবেক জন্মাবে। যার বিবেক আছে সে মন্ত্রী হবে কী করে ?'

'তবে কী লাগে ? টাকাকড়ি ?'

'কিছুমাত্র না। বিনয়দার অবস্থা কী! নো অস্টেনসিবল মিনস অফ লাইভলিহুড।' চোখের ইঙ্গিতটা কৌতুকে উজ্জ্বল করল শুভময়ঃ 'আর পরের বার আমি যদি দাঁড়াই, আমার অবস্থা তো বিনয়দার চেয়েও বিনীত।'

সমস্ত বিষয়বৈভব অসার ভস্মমুষ্টি—জগৎপতির মনে এক পলকের জন্যে বৈরাগ্যের উদয় হল। ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করলে, 'তাহলে কী লাগে ?'

'শুধু পার্টি, পার্টির একজন হওয়া লাগে। আই বিলঙ টু দি পার্টি—শুধু এই উন্নতির ছাড়পত্র। বিত্ত না অর্থ না চরিত্র না—

আর কোনো যোগ্যতা না, শুধু দলের দলী হওয়া। শুধু ভলানটিয়ারি করা।'

'শুধু ভলানটিয়ারি?'

'এখন তো তবু একটা কিছু করতে হচ্ছে, কয়েক বছর আগে হলে শুধু গাঁজার দোকানে পিকেটিং করেই মন্ত্রী হতে পারতাম।'

যেন মেনে নিতে পারছেন না এমনি কষ্ট-মাখা মুখ করলেন জগৎপতি।

'কেন নয় বলুন? ডেমোক্র্যাসিতে আর কী লাগে? ডেমোক্র্যাসিতে পার্টি ছাড়া আর কী আছে? পার্টি ছাড়া আর কোনো ধর্ম নেই কর্ম নেই তীর্থ নেই। স্লোগানের বাইরে কোনো গান নেই। এই ধরুন না আমাকে। আমি পার্টির একজন য়্যাকটিভ মেম্বার, আমার উদ্দেশ্য আরো কী করে য়্যাকটিভ হব, কী করে আসব দলের ফ্রণ্ট লাইনে। আমার সামনে দলবাজি ছাড়া আর আদর্শ কী! আর আমি যদি একবার দলের মধ্যে অগ্রণী হতে পারি, মানে, ঠেলাঠেলি করে পারি এগিয়ে আসতে, তখন আমাকে নির্বাচনের টিকিট না দিয়ে যাবে কোথায়? আমার পল্লীতে আমি ছাড়া আর আছে কে?'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জগৎপতি বললেন, 'কিন্তু শুধু টিকিট পেলেই তো চলবে না।'

'বাকিটা পার্টি দেখবে। চেষ্টা করবে তার প্রেস্টিজ রাখতে। নিয়ে আসবে তার ফাণ্ড, তার কাগজ, তার অর্গাইনেজেশন। আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছুই করণীয় নেই। আমি কেন লেখাপড়া করতে যাব? আমার টাকাপয়সা না থাকলেই বা কী আসে যায়? আর চরিত্র? ও তো একটা সুবিধের কথা।'

'কিন্তু ভোট যারা দেবে তাদের কাছে তো একটু প্রিয় হতে হবে?'

'তারই জন্যে তো সমিতি করা। দুঃস্থের সেবা করা, নিরানন্দকে

আনন্দ দেওয়া—মানে কিনা—' কুটিল রেখায় হাসল শুভময় : 'জন-সংস্পর্শ ঘটানো।'

'চলো দেখে আসি তোমাদের সমিতি।' উঠে পড়লেন জগৎপতি।

পায়ে হেঁটে যাবারই ইচ্ছে ছিল জগৎপতির, কতটুকুনই বা পথ—কিন্তু শুভময় বললে, 'না, গাড়ি করে চলুন। সব পথটাই পায়ে হেঁটে গেলে কেউ ইমপ্রেসড হয় না, খানিকটা মোটরে গিয়ে বাকিটা পায়ে হাঁটলেই লোকে মহানুভব বলে।'

দুখানা ছোট-ছোট ঘর নিয়ে সমিতির বসবাস। একখানা ঘরে কটি আলমারিতে কিছু বই ও মাঝখানে টেবলের উপর কটা ছেঁড়া পত্রিকা আর তাকে ঘিরে কটা নড়বড়ে চেয়ার। পাশের ঘরটাতে কিছু খেলার ও থিয়েটারের সরঞ্জাম।

'সমিতির শক্তি জিনিসে নয়, মানুষে।' টিপ্পনী ঝাড়ল শুভময়।

'তা আর বলতে। কিন্তু দুঃস্থের সেবাটা কী হয়?'

'বস্তি-অঞ্চলে শিশুদের দুধ দেওয়া হয়, ওষুধ দেওয়া হয়, কোথায় কোনো বিরোধ ঘটলে তার মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়, রাস্তার আবর্জনা সাফ না হলে তুলে নিয়ে কাউন্সিলারের বাড়ির সামনে জড়ো করা হয়—' প্রকাণ্ড লিস্টি দিলে শুভময়।

'আর আনন্দের ব্যবস্থা?' রিডিং-রুম আর লাইব্রেরির দিকে কটাক্ষ করলেন জগৎপতি : 'এই মাত্র?'

'না। আরো আছে। মাঝে মাঝে প্রসেশান করা আছে। প্রভাত-ফেরী থেকে পূজো পার্বন করা। আর লক্ষ্যে-উপলক্ষ্যে জলসা করা, থিয়েটার করা—আর বুঝতে পাচ্ছেন—এতেই জনগণের বেশি ফুর্তি।'

'এ সব তো ভালোই কিন্তু স্থায়ী কোনো একটা সমাজসেবা হয় এটাই কি ভালো নয়? যেমন ধরো নাইট-স্কুল, বেবি-ক্লিনিক—'

'নিশ্চয়। একশোবার। আপনি যদি আসেন—'

আসবেন বলেই তো এগিয়েছেন জগৎপতি। তরুণ সমিতির আওতায় নিজের বাড়িতে সভা ডাকলেন। সভ্য যারা আছে তারা তো বটেই, বাইরের ভদ্রলোকদেরও নিমন্ত্রণ হল। লোকসেবা দরিদ্র-সেবার মত মহৎ ব্রত আর কী আছে, কিন্তু তার জন্যে টাকা দরকার। আন্তরিক কর্মী যদি পাওয়া যায় টাকার অভাব হবে না। আর তরুণ সমিতির কর্মীরা যে আন্তরিক এ কে সন্দেহ করবে?

প্রথমেই সমিতির জন্যে বড় ঘর দরকার। নকুলবাবুর দোতলার ভাড়াটেরা বদলি হয়ে উঠে যাবে শুনছি, সেটা সমিতির জন্যে বিনা সেলামিতে নেওয়া যায় হয়তো। তারপর জগৎপতিবাবু নিজে যখন হাল ধরেছেন তখন আর ভাবতে হবে না।

কিন্তু আরেকটা দিক দেখা দরকার। স্বাধীন ভারতে পুরুষ আর মেয়ে দুয়েরই সমান অধিকার, সমান ভোট। তাই তরুণ সমিতিতে মেয়েদেরও আসা উচিত। অন্তত তাদের আসার পথে কোনো বাধা রাখা অসঙ্গত।

বা, জলসা কি থিয়েটারে পাড়ার মেয়েরা তো নামেই। কখনো-কখনো প্রসেশনে।

হ্যাঁ, এবার তাদের 'অফিস' দিতে হবে। মন্দ কি, লেডিস সেকশানই খোলা হোক। তাদেরও ক্লাব-লাইফ, সঙ্ঘশক্তি দরকার। তাছাড়া বস্তি-এলাকায় এমন বহু সমস্যা আছে যা মেয়েদের পক্ষেই চর্চা করা সম্ভব, হয়ত শোভনও।

সমিতির নাম স্যার? তরুণ-তরুণী?

নাম যা আছে তাই থাকবে। তরুণের মধ্যেই তরুণী অন্তর্ভুক্ত। আমরা সবাই তরুণ।

হুল্লোড় পড়ে গেল। ঘ্যাঁচ করে জগৎপতি হাজার টাকার চেক কাটলেন। নকুলবাবুর ভাড়াটে দোতলা ছেড়ে দিল সমিতিকে। নকুলবাবু ছেড়ে দিলেন সেলামি।

লেডিস সেক্শানের ইন-চার্জ কে হবে এই নিয়ে এখন প্রশ্ন।

আগে মেয়েরা আসুক। জমুক। তারপর তারাই ঠিক করবে কে হবে তাদের ইন-চার্জ।

'তরুণ সমিতিটা ক্যাপচার করা যাক।' রুচিরাকে বললেন জগৎপতি, 'তুই লেডিস সেকশানের ইনচার্জ হ।'

উৎসহে মেতে উঠল রুচিরা। বললে, 'খুব ভালো কথা। সোশ্যাল সার্ভিস আমার চিরকালের ফেভরিট সাবজেক্ট—'

রুচিরার স্বরে সত্যের টান পেয়ে একটু বুঝি ভড়কালেন জগৎপতি। বললেন, 'আগে তোর পরীক্ষাটা হয়ে যাক।'

'তা তো বটেই। কিন্তু বিকেল-বিকেল বাড়ি-বাড়ি ঘুরে রিক্রুট করতে বাধা নেই।'

'তারপর তোরা দলে যখন ভারী হবি,' বাড়িতে জগৎপতি লঘুতার স্বরই বজায় রাখতে চাইছেন, 'তখন ওটাকে একটা মহিলা সমিতি করে নেব, আর তোর মা তার অধিনেত্রী হবে।'

'রক্ষে করো।' এণাক্ষী নিশ্বাস ছাড়ল : 'শান্তিতে আছি তাই থাকতে দাও। ওসব বস্তি-সংস্কারে আমি নেই।'

এণাক্ষীর সেকেলে কথায় কে কান দেয়। মাস-মাস চার আনা চাঁদা, মেয়ে মন্দ জোগাড় করল না রুচিরা। বড়-লোকের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, দরজা থেকে কী করে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য কেউ-কেউ আপত্তি তুলেছিল, পুরুষমেয়ের একত্র সমিতি কেন? সেকশন যদিও নামকা ওয়াস্তে আলাদা রাখা হয়েছে, কেন্দ্র এক। রুচিরা আর তার সহচরীরা হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা। একত্র নয় কোথায়? কলেজে একত্র, ইউনিয়নে একত্র, অফিসে, য়্যাসেম্ব্লিতে, সেক্রেটারিয়েটে—সর্বত্র। জলসায়, সিনেমায়, থিয়েটারে। একত্র না হয়ে উপায় কী! সংবিধানেরই তাই নির্দেশ। সামান্য একটা পাড়ার সমিতিতে উলটো হতে যাবে কেন?

শুভময়কে গিয়ে বললে, 'লেডিস সেকশানটা তুলে দিন।'

'তুলে দেব?' শুভময় এমনভাবে তাকাল যেন তার বুকের মধ্য থেকে কে হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে ফেললে।

'তুলে দেবেন মানে মিলিয়ে দেবেন, য়্যামালগেমেট করে দেবেন।' রুচিরা বললে। 'ক্লাব এক হয়ে যাবে, তার কোনো বিভাগ থাকবে না।'

'তার মানে এক পাখির দুই পাখা নয়, দুই পাখায় এক পাখি।' প্রাঞ্জল করল শুভময়ঃ 'একত্র না হলে কমরেডশিপ, সহমর্মিতা জন্মায় না।'

'হ্যাঁ,' হাসল রুচিরাঃ 'যাকে বলে, এক প্রাণ এক মন একতা।'

'তা আপনার বাবাকে বলুন।'

'বাবাকে বলতে যাব কেন? এ আমরা নেক্সট্ মিটিং-এ নিজেরাই পাশ করিয়ে নেব।'

'তা হলে আপনার পজিশনটা কী রকম হবে?'

'আপনার যা আমারও তাই। সমান-সমান।'

'সমান-সমান?'

'হ্যাঁ, আমি আপনারই মত জয়েণ্ট সেক্রেটারি। ওটা পাশ করিয়ে নিন।'

'চমৎকার হবে। বাঙলায় বলবে যুগ্ম সম্পাদক।'

পরের মিটিং-এ তাই পাশ করিয়ে নিল। শুনে জগৎপতি খুব উচ্ছ্বসিত হলেন না। বাড়িতে রুচিরাকে বললেন, 'এতটা সক্রিয় হবার কী দরকার? চুল না ভিজিয়ে সাঁতার কাটাই তো ভালো। যাকে বলে ধরি মাছ না ছুঁই পানি।' সূক্ষ্ম করে হাসলেন বিজ্ঞের মত।

'না, না, কোনো কিছুতে লাগতে হলে সর্বশক্তি দিয়েই লাগতে হয়।'

কিন্তু রুচিরার কী দুর্দান্ত শক্তি তা কি এই বাউণ্ডুলে পাড়া জানে?

কী করে জানবে!

তাই রুচিরার পরীক্ষা হয়ে যেতেই জগৎপতি নিজে একটা জলসাতে উদ্যোগী হলেন। আর তার মধ্যে একটা গীতিনাট্য ঢুকিয়ে দাও। রুচিরা নাচবে গান গাইবে অভিনয় করবে।

হ্যাঁ, এবার আর খোলামেলা প্যাণ্ডেল নয়, স্টেজওয়ালা হল-এ, আর, কণ্ঠস্বর দৃপ্ত করলেন জগৎপতি, দস্তুরমত টিকিট বেচে।

আর এভাবেই আয়-আদায় বাড়াতে হবে সমিতির।

উদ্যম-উৎসাহে উন্মাদ হয়ে উঠল শুভময়। জামার বুকের শেষ বোতামটাও খুলে ফেলল।

জগৎপতি নিজেও কিছু টিকিট বেচলেন। ব্যারিস্টার মহলে, ইঞ্জিনিয়ার মহলে, ফার্মে-কোম্পানিতে। পাত্রস্থ করবার আগে মেয়েকে মঞ্চস্থ করি। তাকে আগে দেখ, শোনো, তারপরে যদি উপযুক্ত বুঝি আলাপ করিয়ে দেব।

কয়েকজন অতিথি-শিল্পীকেও নেওয়া হল। কয়েকজন বা সীমান্তবর্তিনীকে। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। আর রোমহর্ষক টিকিটবিক্রির পরিচয় যত না ভিড়ে তত, বা, তার চেয়েও বেশি, দুর্মদ হাততালিতে।

আর কী গায়, কী বা নাচে! নাচের কাছে গান কি! দেখেছ কেমন আনন্দের বৃষ্টি। প্রতিটি ভঙ্গি কেমন লাবণ্যে লালিত-পালিত। লাস্য আর বিন্যাসের কারিকুরি, রেখার আর চূড়ার আর গহ্বরের। অভিনেত্রীর কাছে নর্তকী কী! দেখেছ কেমন উচ্চারণ কেমন অল্প দিয়ে অসামান্যের ইশারা। আর সমস্ত কিছুর মাঝে যে একটি শালীন নম্রতা আছে, মার্জন-ভূষণ আছে, তার রহস্য হচ্ছে রুচিরা শিক্ষিতা। আর সবচেয়ে যা মজবুত তা হচ্ছে এই শিক্ষার আভিজাত্য। কিন্তু

যাই বলো, সব কথার শেষ কথা হচ্ছে মেয়েটা ধনী। ধনে-জনেই রুচিরা মনোহারিকা।

জলসার সাফল্যে জগৎপতির বুক-কাঁধ আরো চওড়া হয়ে উঠল। কিন্তু এণাক্ষীর সব মামুলি কথা। সে উঠল ঝাপটা মেরে ঃ 'কিন্তু মেয়েটাকে তো শুধু নাচালে চলবে না, বিয়ে দিতে হবে তো!'

'এইবার নূপুরের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল, এইবার আসবে সব যোগ্য পাত্রের আবেদন।'

'সে সব দরখাস্ত তুমিই যাচাই করবে নাকি?' এণাক্ষী কটাক্ষ হানল।

'প্রথম স্ক্রুটিনিটা আমি করে দিলেই কি ভালো হয় না? পরে ইণ্টারভিউ করে শেষ বাছাই মেয়ে করে নেবে।'

'তার মানে তুমি তোমার ইচ্ছামত পাত্র ধরে আনবে আর তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলে তাদের ভেতর থেকে মেয়ে একজনকে চরম বেছে নেবে বলতে চাও?' এণাক্ষীকে প্রায় ক্রুদ্ধ শোনাল।

'আমি বুঝি অমনি করে বললাম?'

জগৎপতি তাঁর বক্তব্যটা বিশদ করলেন। মেয়ে নিজেই যদি তার বর নির্বাচন করে জগৎপতি তাতে বাধা দেবেন না, বাধা দেবার তাঁর অধিকারই বা কী। কিন্তু তার নির্বাচনটা সুষ্ঠু হয় এটুকু তো তিনি দেখতে পারেন। বা, তার নির্বাচনে মতামত দিতে গেলে তো সে সেই তার স্বাধীনতাতেই হাত দেওয়া হল। কিন্তু, প্রশ্ন এই, তার সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রটা কতটুকু? ক্ষেত্রটা নিতান্ত সংকীর্ণ বলে মেয়েরা সাধারণত কী করে? যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই ধরে বসে। তাই কখনো পরিবারের মধ্যেই প্রেম ঘটায়। আমার বক্তব্য হচ্ছে মেয়েদের নির্বাচনের ক্ষেত্রটা বড় করে দেওয়া উচিত, বাজারটা বড় হলেই জিনিসটা ভালো পাবার সম্ভাবনা। তাই ভাবছি কি, বাড়িতে এবার গণ্য-মান্যদের যোগ্য-ভোগ্যদের ডেকে আনি, রুচিরার জন্যে বাজার বড় করি।

এটা মন্দ কী, সায় দিতে এণাক্ষীর বেগ পেতে হল না।

'অসম্ভব।' বিয়ের ইঙ্গিতও রুচিরা কাছে ঘেঁসতে দেয় না। বলে, 'আমার অনেক কাজ।'

শুভময়কে গিয়ে বললে, 'দেখুন আমাদের সমিতির দুটো দিক আছে, একটা কালচারাল আরেকটা সোশ্যাল। এ পর্যন্ত আমরা আগেরটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি, কিন্তু আমার মনে হয়—'

'আপনার ঠিকই মনে হয়, সোশ্যালটাই বেশি জরুরি।'

'চলুন না। বস্তিতে-কলোনিতে যাই, ওদের কী গ্রিভ্যান্স তার খোঁজ নিই।'

'ওদের অনন্ত গ্রিভ্যান্স, খোঁজ নিয়ে শেষ করতে পারবেন না,' হাসল শুভময়, 'তার চেয়ে আমরা বরং আমাদের শক্তির খোঁজ নিতে পারি। মানে, আমরা কতদূর কী ক্ষমতা রাখি তার খোঁজ।'

'আমরা স্কুল খুলতে পারি।'

'ঠিক বলেছেন। নাইট স্কুল তো আমাদের প্রেসিডেন্টের পেট প্রোজেক্ট।'

'হ্যাঁ, আমি যা বুঝি, একমাত্র শিক্ষার অভাবই আমাদের সমস্ত ব্যাধির মূল। শিক্ষার অভাবের জন্যেই আমাদের অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অধর্ম—'

'সব কিছু।' অসহিষ্ণু হয়ে শুভময় বললে, 'তাহলে শিগগির একদিন কমিটির মিটিং ডাকি।'

'এর আবার মিটিং কী!' রুচিরাও কম অসহিষ্ণু নয়। 'এ সবচেয়ে সোজা কাজ। যে কেউ ইচ্ছে করলে যাকে খুশি এক নিরক্ষরকে আলোকিত করে তুলতে পারে।'

'তবু সমিতির বিধি-পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। তা, কমিটিতে ওটা পাশ করে নিতে কতক্ষণ।'

সেই সম্পর্কেই শুভময় জগৎপতির কাছে এসেছে।

'আমি একটা খুব বড় কেস নিয়ে মফস্বলে যাচ্ছি। ফিরতে কদিন দেরি হতে পারে।' জগৎপতি আশ্বাসের স্বরে বললেন, 'তা আমি না থাকি, আমকে বাদ দিয়েই করে নিয়ো। স্কিম তো খুব চমৎকার! কী নাজানি কথাটা ? লোক-কল্যাণকর।'

'না, না, আপনি আসুন—'

চলে যাচ্ছিল শুভময়, জগৎপতি ডাকলেন। বললেন, 'আচ্ছা, ধরো, নেক্সট ইলেকশানে পার্টি তোমাকে টিকেট দিল না, অন্য লোককে দিল, তা হলে তুমি কী করবে ?'

'বা যতক্ষণ পার্টিতে আছি ততক্ষণ পার্টির ম্যাণ্ডেট মানব, ভাঙব না তার ডিসিপ্লিন।' খোলা বুকে বীরের মত বললে শুভময়।

'যে টিকিট পাবে তার জন্যে খাটবে তুমি ইলেকশানে ?'

'আপ্রাণ খাটব। বিনয়দার জন্যে খাটিনি ? তবে এবার বুদ্ধিমান হব। আগে সাব-কণ্ট্রাক্ট দাও পরে অন্য কথা।'

'এম-এল-এ হবার আগেই কণ্ট্রাক্ট দেবে কী করে ?'

'তা হলে নগদ বের করো। তেল মাখবার আগে কড়ি ফেল।'

'তা বলতে পারো।'

'শুধু সিঙাড়া খেয়ে শ্লোগান দিতে পারব না।'

'তা বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি তোমাদের সমিতিকে খুব সুখ্যাতি করলেন। বললেন সবুর করতে। সময়মত গ্র্যাণ্ট-ট্র্যাণ্ট পাইয়ে দেবেন অনেক কিছু।'

'তা হলেই হল।' প্রশস্ত বুক ভরে নিশ্বাস নিল শুভময়ঃ 'আমি আমার নিজের জন্যে কিছু চাই না। সমিতি যদি পায়, তাহলে আমিই পেলাম। সমিতি বড় হলেই আমার বড় হওয়া।'

সকাল থেকেই তেতলায় ঠুকঠাক শব্দ হচ্ছে। কখনো হঠাৎ দুদ্দাড় শব্দ।

'কী ব্যাপার ?' রুচিরার দিকে তাকাল এণাক্ষী।

'কিছু একটা মেরামত হচ্ছে মনে হচ্ছে—' রুচিরারও স্বস্তি নেই।

ক্রমশই বাড়ছে সে শব্দ। হঠাৎ কতগুলি ইঁট খসে পড়ল নিচে। মনে হল তেতালার ছাদের দেয়াল ভাঙা হচ্ছে।

'একবার দেখে আসবি ?'

'সজ্জন সিং বাড়িতে আছে কিনা ঠিক কী।'

এণাক্ষী নিজেই আবার বারণ করল। বললে, 'কী জানি কী, মিলিটারির কাণ্ড, মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। থাক, গিয়ে কাজ নেই।'

বারণ সহ্য করতে পারে না রুচিরা। আর এ বুঝি তার ভীরুতা তার অপটুতার উপর কটাক্ষ।

সটান উঠে গেল রুচিরা।

সিঁড়ির প্রান্তে দেখতে পেল সজ্জনকে। রুক্ষ মুখে স্পষ্ট ইংরিজিতে জিগগেস করল : 'এসব কী হচ্ছে ?'

সজ্জন সিং বুঝতে পেরেছে অভিযোক্তা কে। কথার সে কোনো উত্তর দিল না। চেষ্টারও ধার দিয়ে গেল না। বরং পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তার ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল।

এ কী অসৌজন্য ! আরো দুধাপ উপরে উঠল রুচিরা। স্বর আরো একটু চড়া করে বললে, 'জানতে পারি কি কেন এত গোলমাল হচ্ছে ? কেন এত সব ভাঙাচোরা ?'

'এসব জেনে আপনার কাজ নেই।' শুধু ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্নের জবাব দিল সজ্জন।

'নিশ্চয়ই আছে। যেহেতু আমরা এ বাড়ির মালিক। আপনাকে তেতলায় শুধু থাকতে দেওয়া হয়েছে। ছাদ-দেয়াল ভেঙে ফেলতে দেওয়া হয়নি।'

'সে আমি বুঝব, আমার ডিপার্টমেণ্ট বুঝবে।' দস্তুরমত সিঁড়ির দিকে চাক্ষুষ ইশারা করল সজ্জন: 'আপনি এখানে নাক ঢোকাতে আসবেন না। নিজের চরকায় তেল দিন গে যান।'

'না, বিনা অধিকারে আমার বাড়ির কী ক্ষতিসাধন করছেন তা আমাকে দেখতে হবে স্বচক্ষে।' রুচিরার ভঙ্গিও কম জঙ্গী নয়।

'আপনারই অধিকার নেই বিনানুমতিতে আমার ফ্ল্যাটে ঢোকবার—' উদ্যত বাধার মত দরজা জুড়ে দাঁড়াল সজ্জন সিং।

'এ কী, ওপাশের জানলাটাই আপনি লোপাট করে দিয়েছেন!' শেষ পর্যন্ত না উঠে এখান থেকেই নজর করতে পেরেছে রুচিরা। 'এ সবের মানে কী? হচ্ছে কী এ সব?'

এবার ইঞ্জিনিয়র সাহেব দয়া করলেন। বললেন, 'তেতলাটা এয়ারকণ্ডিশণ্ড হচ্ছে। তারই জন্যে হচ্ছে খানিক রদবদল।'

'এয়ারকণ্ডিশণ্ড হচ্ছে, তার জন্যে বাড়িওলার অনুমতি নিয়েছেন?'

ইঞ্জিনিয়র বললেন, 'তার আমি কী জানি?'

'আপনাকে জিগগেস করা হয়নি। যে এ বাড়ির টেনেণ্ট তাকে জিগগেস করা হয়েছে।'

'আর সেই টেনেণ্ট জবাবদিহি করবে আপনার কাছে নয়, আপনার বাবার কাছে, যিনি এ বাড়ির আসল মালিক, যিনিই আমাকে বসিয়েছেন ভাড়াটে।' কোমরে হাত রেখে রুখে দাঁড়াল সজ্জন।

'বাবা এখন বাড়ি নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমিই তাঁর প্রতিনিধি।'

'যান-যান। তিনি মরে গেলে আসবেন।' বিদ্রূপে ঝিলকিয়ে উঠল সজ্জন। 'যতদিন তিনি বেঁচে আছেন আপনি কেউ নন, কিছু নন।'

'আমি যতদিন বেঁচে আছি, আমিই সমস্ত। সহ্য করব না আপনার ঔদ্ধত্য।'

'যা করতে পারেন করুন।' পিছন ফিরে সজ্জন আবার ইঞ্জিনিয়রকে নিয়ে পড়ল।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে নিচে নেমে গেল রুচিরা। এণাক্ষীকে একবার জিগগেস করল, তেতলায় কোনো ঘর এয়ারকণ্ডিশাণ্ড করার অনুমতি বাবা দিয়েছেন কিনা। কখনো না। তা হলেই হল। একেবারে নিচে নেমে গেল রুচিরা। আর খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে একেবারে তরুণ সমিতিতে।

সমিতির আড্ডিকিতে সকালেও একবার হাজিরা দেয় শুভময়, সাঙ্গোপাঙ্গরাও কেউ-কেউ থাকে, সহসা সেখানে এসে দাঁড়াল রুচিরা। রুক্ষ, দীপ্ত, অবিন্যস্ত।

'শুনুন। একবারটি বাইরে আসুন।' রুচিরা অন্তরঙ্গের মত ডাকল।

যদিও জানে কাকে ডাকছে তবু শুভময় নিজের বুকের উপর আঙুল রাখল : 'আমাকে বলছেন ?'

'আর কাকে ?'

হ্যাঁ, আমি ছাড়া আর কে আছে বিশ্বভুবনে, বীরত্বের এমনি ভঙ্গি করে রাস্তায় বেরিয়ে এল শুভময়।

সমস্ত বললে রুচিরা। এর প্রতিবিধান কী ?

মালিক-শ্রমিক বিরোধে সমিতি চিরদিন শ্রমিকের পক্ষে লড়েছে। মহাজন-খাতকের সংঘর্ষে খাতকের পক্ষে। তেমনি বাড়িওলা-ভাড়াটের ঝগড়ায় ভাড়াটের পক্ষে। কোন দিকে ন্যায় বা সত্য তার মধ্যে যায়নি, শুধু পক্ষ দেখেছে।

এবারও পক্ষ দেখল। রুচিরা বাড়িওলা এ প্রশ্ন আর উঠল না। রুচিরা রুচিরা। রুচিরাই সমিতি।

'চলুন। কী স্পর্ধা! ভদ্রমহিলাকে অপমান করে।'

এক বাক্যে এত ক্ষেপে উঠবে এ ভাবতেও পারেনি রুচিরা। যেন খোলা তলোয়ারের ডগার উপর লাফিয়ে পড়তে ছুটেছে শুভময়। নিরস্ত করবার দুর্বল চেষ্টা করল রুচিরা। বললে, 'থানায় খবর দিলে কেমন হয়?'

'থানার রাস্তা তো জানা নেই।' অস্পষ্ট একটু হাসল শুভময়ঃ 'আইনের বাহুর চেয়ে নিজের বাহুকেই চিরদিন দীর্ঘ ও বলবান মনে করে এসেছি।' বলে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল তেতলায়।

দোতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিল রুচিরা। বাকিটা শুভময় তাকে উঠতে দিল না। বললে, 'আপনি আপনার জায়গায় থাকুন, একা আমি যাচ্ছি। এখানে যুগ্ম হয়ে লাভ নেই। এখানে একা এক পুরুষ থাকাই ভালো।'

বাকি সিঁড়িটা প্রায় একলাফে উঠে গেল শুভময়। দেখল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

তবু ছেড়ে দেবার মতন ব্যাপার নয়। এখানে এক বাঙালি তরুণীকে অপমান করা হয়েছে। আর সে তরুণী যে-সে নয়। সমিতির অন্যতর সম্পাদিকা। তার মানেই সমিতির অপমান। আর শুভময় যখন সহকারী তখন তারও।

দ্রুত ও দুর্বিনীত কড়া নাড়তে লাগল শুভময়।

সজ্জন সিং গ্রাহ্যও করল না।

'কাওয়ার্ড।' শুভময় গর্জন করে উঠল।

আর যায় কোথা! যেন ঝড়ের ধাক্কায় দরজা খুলে গেল। 'হোয়াট ডু ইউ মিন?' হুমকে উঠল সজ্জন সিংঃ 'তুমি কে?'

'আমি যেই হই না কেন, তুমি কোন সাহসে বাঙালি ভদ্রমহিলাকে অপমান করো?'

'বেশ করি। তাতে তোমার কী! তুমি বলবার কে? তুমি এ বাড়ির কেউ নও। তুমি একটা রাস্তার লোক।'

'রাস্তার লোক ? বেশ, নেমে এস রাস্তায় ।'

'তাই, যাও, নামো গে । অন্তত যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, দোতলা-তেতলার এই সিঁড়ি—এ আমার টেনান্সির মধ্যে । সুতরাং তুমি একটা ট্রেসপাসার । গুলি করে তোমাকে আমি শেষ করে দিতে পারি ।' বলতে-বলতে প্রবল আক্রোশে দরজা আবার বন্ধ করে দিল সজ্জন ।

'বার করছি তোমার গুলি-করা ।' রাগে গরগর করতে করতে নেমে গেল শুভময় ।

দোতলা থেকে যখন একতলায় নামছে তখন রুচিরা চাইল তার পিছু নিতে ।

এণাক্ষী মুখিয়ে উঠল ঃ 'তুই কোথায় যাচ্ছিস ?'

'যা, দেখি কী হয় ।' ছটফট করে উঠল রুচিরা ।

'এখন ঝগড়া তো ওদের দুজনের । ওদের মধ্যে তোর এখন গিয়ে পড়বার কী হয়েছে ! শোন, যাসনে—'

'কী আশ্চর্য, আমাকে নিয়েই তো ঝগড়া । আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমি সরে রইলাম এটা কেমন কথা !' কথা শুনল না রুচিরা, নিচে নেমে গেল ।

উত্তেজনায় আরো বুঝি ইন্ধন পড়ল । শুভময় বললে, 'বলে কিনা গুলি করবে । তার আগেই ঢিলিয়ে ঢিট করে দেব বাছাধনকে ।'

বলতে-বলতেই দলের কটা ছোকরা তেতলার বারান্দা তাক করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল । সে বারান্দাতেই তখন দাঁড়িয়েছিল সজ্জন আর ইঞ্জিনিয়র । একটা ঢিল তো ইঞ্জিনিয়রের টুপির উপর পড়ল, আরেকটা সজ্জনের কান ঘেঁষে দেয়ালের গায়ে । আর কটা এখানে-ওখানে জানলা-দরজায় ।

তবে রে—একেবারে একটা বন্দুক নিয়ে নিচে ছুটে এল সজ্জন । ঢিলযুদ্ধের কে সেনাপতি আন্দাজ করতে তার দেরি হল না ।

'কই সেই স্কাউণ্ড্রেলটা কোথায়?' মুখে এই সিংহনাদ। 'কই সেই রিংলিডার?'

এদিকে-ওদিকে খুঁজতে হল না, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে শুভময়। যেমন বুকখোলা তেমনি। বললে, 'মারবে তো মারো। আমি তোমার মত কাওয়ার্ড নই। লক্ষ্যহীন ঢিলের উত্তরে সোজাসুজি বন্দুক নিয়ে আসি না—'

চোখের পলকপাতে কী না জানি কাণ্ড ঘটে যাবে মুহূর্তে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় দিশেহারার মত রুচিরা হঠাৎ শুভময়কে আড়াল করে দাঁড়াল। সজ্জনের বুঝি আর গুলি ছোঁড়া হল না। দ্বিধায় এক মুহূর্তে তুলে-যাওয়ার অর্থই পাহাড়ের চূড়ার শেষ ও শাণিত বিন্দু থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে যাওয়া মাটিতে।

প্রায় একেবারে রাস্তায় নেমে এসেছিল সজ্জন, কিন্তু গুলি যখন ছোঁড়া হল না তখন আর দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়ঃ চারদিকে লোক ছুটে আসছে ধর-ধর মার-মার করতে-করতে, এখুনি মত্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়বে সজ্জনের উপর আর বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে লগুড় করে তুলবে। সুতরাং সাহসের আসলই হচ্ছে বৈচক্ষণ্য, এ সনাতন মন্ত্র বিবেচনা করে যেমন এসেছিল তেমনি পালিয়ে গেল সজ্জন। ফ্ল্যাটে ঢুকে সিঁড়ির দরজা সবলে বন্ধ করে দিল।

জনতার তখন মহাস্ফূর্তি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হৈ-হল্লা করতে তখন অনেক সুবিধে।

বেরিয়ে এস। খালি হাতে বেরিয়ে এস। দেখি তোমার কেমন মুরোদ, কতটা আস্ফালন।

জিরো-তে ডায়াল করল এণাক্ষী।

পুলিশের গাড়ি এসে গেল। শুভময় আর সজ্জনকে নিয়ে গেল থানায়। রুচিরাকে লক্ষ্য করে বলে গেল, আপনিও প্রস্তুত থাকুন।

পরদিন এসে পড়লেন জগৎপতি। ব্যাপারটা জেনে প্রথমেই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল এটা তাঁর ইলেকশনের কাজে লাগবে কিনা। একবার মনে হল লাগবে, আরেকবার ভাবলেন, লাগবে না। আর যাই হোক, এতদূর গড়াতে দেওয়ার দরকার ছিল কী ?

'খুব নাটক শিখেছিস, না ?' ভয়ে উদ্বেগে জর্জর, এণাক্ষী সরাসরি রুখে উঠল : 'অমন করে পোজ দিয়ে দাঁড়াবার কী হয়েছিল ?'

'মানে ?' দারুণ বিরক্ত হল রুচিরা : 'তুমি কোত্থেকে দেখলে ?'

'জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম। আমার বুক কাঁপছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! জানো, দেখলাম,' এবার স্বামীর দিকে তাকাল এণাক্ষী : 'উনি একেবারে দেয়াল হয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেন। ভাবখানা এই, গুলি করতে হলে আমাকে করো। কী নাটক! কী নাটক!'

'যে আমার জন্যে বিপন্ন হয়েছে তাকে আমি রক্ষা করবার চেষ্টা করব না ?'

'তারই জন্যে তুই ও লোকটার অমন গা ঘেঁষে দাঁড়াবি ?' এণাক্ষীর জিভ প্রায় লকলক করে উঠল।

'গা ঘেঁষে দাঁড়ালে কী হয় ?' রুচিরাও কম জ্বলে উঠল না : 'কাছাকাছি হয়ে না দাঁড়ালে ওকে আড়াল করা যায় কী করে ?'

'কিন্তু যদি, মা, ছুঁড়ে দিত গুলি ?' জগৎপতি মন-মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলেন।

'কই দিল না তো! আমাকে দেখেই তো ভড়কে গেল!'

'কী দরকার ছিল ভড়কিয়ে দেবার। ছুঁড়লে ছুঁড়ত গুলি! যে মরবার মরে যেত।' এণাক্ষী উঠল আবার ফোঁস করে।

'মরে যেত।' রুষ্ট রেখায় হাসল রুচিরা।

'কত লোকই তো পথে-ঘাটে মরছে এমন য়্যাকসিডেণ্টে।

হঠকারীরা অমনি মরেই থাকে। তাছাড়া ও তো গুলি খাবার জন্যে বুকের জামা খুলেই রেখেছে।' সারা শরীরে রি-রি করছে এণাক্ষী।

এতটা স্পষ্টাস্পষ্টি জগৎপতির পছন্দ হল না। তাঁর কৌশল হচ্ছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কৌশল। দেখাবেন শাক খাবেন মাছ। খাবেন পটল বলবেন উচ্ছে। তাই বললেন, 'অমন করে বলছ কেন ? শুভময়ের দোষ কী ! শুভময় তো মহৎ কাজই করেছে। বিপন্ন যদি সাহায্য চায় ও সাধ্যমত দেবে না সাহায্য ? কিন্তু আমি বলছিলাম—' মেয়ের দিকে তাকালেন।

'কী ?' রুচিরাও তাকাল স্থির চোখে।

'আমি বলছিলাম, তরুণ সমিতি পর্যন্ত যাওয়ার কী দরকার ছিল ? আমি এলেই তো ফয়সালা হতে পারত। বিনানুমতিতে ঘরদোর রদবদল করছে, ওদের ডিপার্টমেন্টে নালিশ করলেই তো শায়েস্তা হত। নয় তো আদালতে যেতাম।' গলার স্বর এতটুকু কাঁপল না জগৎপতির: 'মিছিমিছি বাইরের লোককে এ ঘরের ব্যাপারে টেনে আনতে গেলে কেন ?'

'মিছিমিছি বলছ বাবা ?' রুচিরার স্বরে একটু বুঝি অভিমানের টান লাগল : 'একটা অত্যাচারী যদি পীড়ন করে অপমান করে তাহলেও প্রতিকারের আশায় যেতে পারি না বাইরে ?'

'কী দরকার ! এ তো তেমন কিছু গুরুতর নয় ! যদি চাও তো থানায় ফোন করো।'

'যেমন আমি করেছিলাম।' গর্বের ঢেউ তুলল এণাক্ষী।

'যদি হাতের কাছে সাহায্য থাকে তবুও ?'

'হ্যাঁ, তবুও।' এণাক্ষীই খেই ধরল : 'সব কিছুরই একটা শ্রী আছে, রীতিনীতি আছে। নাটুকেপনাটা ভালো নয়। ভাগ্যিস কারু হাতে তখন ক্যামেরা ছিল না। কেউ ফ্ল্যাশ তুলে নিলেই কেলেঙ্কারি।'

'আহা, অমন করে বলছ কেন?' জগৎপতি আবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইলেন।

'এই যে আপনি এসে পড়েছেন—' সিঁড়ি দিয়ে সটান উপরে উঠতে লাগল শুভময়ঃ 'এ দিকে কী মজা হয়েছে শুনুন।'

কার অনুমতি নিয়ে উঠছে? বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল এণাক্ষী। যেন কোন যুদ্ধ জয় করেছে এমনি গর্বে সিঁড়ি কাঁপিয়ে উঠে আসছে উপরে। 'উপরে কেন?' এণাক্ষী নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারল না। প্রায় দাঁতেদাঁত লাগিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলঃ 'নিচে নিয়ে যাও। এখানে নয়। এখানে কী?'

কথাটা কানে গেল নাকি শুভময়ের? দরজার সামনে দাঁড়াল এক সেকেণ্ড। বললে, 'ভিতরে আসতে পারি?'

'আরে এস এস, তুমি হলে ঘরের লোক, আসবে বৈকি।' জগৎপতি উদার আনন্দে অভ্যর্থনা করলেনঃ 'তুমি ছিলে বলেই কত বড় বিপদ থেকে এঁরা সবাই বেঁচে গেল সেদিন—'

'এখন সজ্জন সিং বলে কী জানেন?' শুভময় হাসতে লাগলঃ 'বলে, বন্দুকে গুলি ছিল না। শুধু ফাঁকা ভয় দেখাবার জন্যেই বন্দুক তাক করেছিল। কিন্তু বন্দুকে গুলি আছে কি না আছে এ কে হিসেব করবে? যে বন্দুকের সামনে বুক দিয়ে দাঁড়াবে, নিশ্চয়ই সে নয়। তার দাঁড়ানোটাই মহৎ, এক কথায় অপূর্ব।' তন্ময় চোখে রুচিরার দিকে তাকাল শুভময়ঃ 'আমি বাঁচিয়েছি কী বলছেন? বাঁচিয়েছেন উনি। শুধু আমাকে নয় সমস্ত তরুণ সমিতিকে। এ যুগের তারুণ্যকে—'

নিচে নামবার উদ্যোগ দেখালেন জগৎপতি। বললেন, 'পুলিশ কোনো কেস-টেস করবে নাকি?'

'চলুন, বলছি।' হাতের এক ঝাপটায় বাজে কথা সব সরিয়ে দিতে চাইল শুভময়। বললে, 'আমরা ঠিক করেছি সমিতির পক্ষ থেকে রুচিরাদেবীকে সম্বর্ধনা দেব।'

'আমাকে ছাড়া কী করে ঠিক হয় ?' হাসি-হাসি মুখ করল রুচিরা।

'আপনার একটা ভোট না হয় বিপক্ষে যাবে, কিন্তু এদিকে আর সবাই হাত তুলে দিয়েছে, আওয়াজ তুলে দিয়েছে—'

'সামান্য কী একটু সাহস দেখিয়েছে, তার আবার সম্বর্ধনা কী !' সহজ গলায় দিব্যি বলতে পারল এণাক্ষী।

'সে পরের কথা পরে দেখা যাবে। এখন চলো নিচে চলো, সজ্জন সিংকে ডাকাই—' শুভময়কে জগৎপতি নিচে নামিয়ে নিলেন।

সজ্জন সিংকে ডাকতে হল না। আর কোনো দিন না। সজ্জন সিং ভেগেছে, ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে। ডিপার্টমেণ্ট তার আচরণ সমর্থন করতে পারে নি। সজ্জন সিং-এর বদলি আর কোনো ভাড়াটেও পাঠায় নি। প্রজাস্বত্বই ইস্তফা দিল ডিপার্টমেণ্ট। এই লোকালয়ে কাজ নেই ভাড়াটে হয়ে।

'বুঝলেন· ঢিলের কাছে গুলি হেরে গেল।' বাহাদুরের মত বললে এসে শুভময়।

'কিন্তু মাস-মাস পাঁচশো টাকার ক্ষতি।' পারিবারিক নিভৃতিতে শোক উঠল।

'মিলিটারির সঙ্গে লড়াই করে তো ভারী হল।' মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করলেন এণাক্ষী : 'সলিড একটা ভাড়াটে উৎখাত হল।'

'ভাড়াটের জন্যে ভাবনা !' ঠোঁট ওলটালো রুচিরা।

'তা হলেও, মাথার উপরে মিলিটারি থাকা, কত বড় প্রেস্টিজ একটা।' এণাক্ষী নড়ে-চড়ে বসল।

প্রকাশ্যে এতটা যেন হজম হচ্ছিল না জগৎপতির। মা-মেয়ের মধ্যে মীমাংসার সুরে বললেন, 'তা নয়, কিন্তু শাঁসালো অথচ ভালো ভাড়াটে পাওয়া দুর্ঘট।'

'আমি বলছি কি বাবা, তেতলাটা আর ভাড়া দিয়ে কাজ নেই।' একটু আবদারের টান আনল রুচিরা।

'সে কী ?'

'ওটা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।' দুই চোখে আনন্দ নিয়ে এল রুচিরা : 'ওটাতে আমি একটা ইস্কুল করি।'

'ইস্কুল ?' এবার চমকালেন জগৎপতি।

'হ্যাঁ, বয়স্কদের না হয়, শিশুদের ইস্কুল।' আনন্দের সঙ্গে স্বপ্ন এনে মেশাল রুচিরা : 'বস্তির ছেলে-মেয়ে, গরিব ছেলে-মেয়ে জড়ো করে এনে পড়াই! আমাদের বাড়িতেই একটা নাইট-ইস্কুল করি। তুমি তো কত নাইট-ইস্কুলের ভক্ত!'

'ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের নাইট-স্কুল কী!'

'বেশ তো ডে-ইস্কুলই না হয় করব। কত বড় কাজ বাবা। আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, এ কত বড় প্রার্থনা!'

'তেতলায় ইস্কুল কী!' এবার এণাক্ষী রব তুলল। 'যত রাজ্যের নোংরা ছেলে-মেয়ে এসে বাড়িঘরদোর একটা জঘন্য খাটাল করে তুলবে এ আমার সহ্য হবে না।'

'বা, তা হতে দেব কেন? ওরা আসুক না তেতলায়। ওরা বুঝুক ওরাও এত উঁচুতে উঠতে পারে। উঠেও পেতে পারে মানুষের মমতা —বাবা—' জগৎপতির কাছে দু' পা বুঝি এগিয়ে এল রুচিরা।

'তুমি ইস্কুল করতে চাও একটা নার্সারি খোলো, কে-জি ক্লাশ চালাও।' গম্ভীর হলেন জগৎপতি : 'এটাই তো আজকাল খুব চলছে, খুব ফ্যাশানেবল হয়েছে।'

'বেশ, তাই খুলি।' মরীয়ার মত বললে রুচিরা, 'কিছু একটা করি।'

'তার জন্যে তোমাকে আলাদা ঘর নিতে হবে, পাঁচশো টাকার আয় তো আর ফেলে দিতে পারি না।'

'তোমার আর টাকা দিয়ে কী হবে বাবা?'

'টাকা দিয়ে আর কী হয়?' হেসে উঠলেন জগৎপতি : 'কিছু হয় না। টাকা দিয়ে শুধু স্কুল হয়!'

ভাড়াটে শুভময়ই জোগাড় করে আনল। উঁচু দাঁড়ের এক মাদ্রাজি অফিসর।

'মাদ্রাজি-পাঞ্জাবি ছাড়া আজকাল আর বড় অফিসর কই?' দুঃখের সঙ্গে অলক্ষ্যে যেন একটু তৃপ্তির আভাস দিলেন জগৎপতি ঃ 'শুধু অফিসরই বড় নয়, টেনাণ্টও ভালো। তা পাঁচশো দিতেই রাজি তো?

'সাড়ে পাঁচশো।' বিজয়ীর মত ভঙ্গি করল শুভময়।

'পঞ্চাশ টাকা বেশি?' সে যেন কত বেশি এমন বেশি-বেশি খুশি হল এণাক্ষী।

'তা ছাড়া—' জগৎপতির কানেকানে বলার মত ভঙ্গি করে অথচ সবাইকে শুনিয়ে শুভময় বললে, 'সেলামিও দেবে বলেছে।'

'দেবে?' দরকার হলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্দনা করতে পারে এণাক্ষী। 'যা হোক তুমি বেশ কাজের ছেলে।'

সন্ধ্যায় সমিতির ঘর থেকে টেনে শুভময়কে বাইরে নিয়ে এল রুচিরা।

'এটা আপনি কী করলেন?'

'কী করলাম।' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল শুভময়।

'আপনি সেক্রেটারি হয়ে সমিতির নিয়মকে অমান্য করলেন?'

তবু যেন সোজা হচ্ছে না বিষয়টা শুভময় এমনি মুখ করল।

'সমিতির নিয়ম হচ্ছে বাঙালি হয়ে বাঙালি ছাড়া অন্য কাউকে বাড়ি ভাড়া না দেওয়া। আপনি এক মাদ্রাজি জোগাড় করে আনলেন?'

'ভাড়া না দেওয়া মানে পারতপক্ষে না দেওয়া।' শুভময় হাসবার চেষ্টা করল ঃ 'নিয়মের মধ্যে একটা 'পারতপক্ষে' আছে।'

'তা বাঙালির জন্যে চেষ্টা করেছিলেন?'

'চেষ্টা করতে গেলেই দেরি হয়ে যেত। আর যত দেরি তত ক্ষতি।

'কার ক্ষতি ?' ঝলসে উঠল রুচিরা।

'কার আবার! আপনাদেব।'

'কিন্তু সেলামি পাইয়ে দিলেন কী বলে? সমিতির জন্যে নকুলবাবুর থেকে দোতলাটা ভাড়া নেবার সময় সেলামির বিরুদ্ধে তো কত আন্দোলন করলেন—'

'বা, সে তো সমিতির জন্যে! আর এ তো উড়ে এসে জুড়ে-বসা বিদেশী ভাড়াটে, একে শুষতে আপত্তি কী।'

'আপনার কোনো নীতিজ্ঞান নেই।'

'নীতি!' তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে হাসল শুভময়। 'সংসারে একটা মাত্র নীতি আছে, সে হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আরো একটু বাড়িয়ে বলতে পারেন, আত্মবিস্তার!'

'ও বাড়ির জন্যে সেলামি পাইয়ে দিলে আপনার প্রতিষ্ঠা হয় কোন হিসেবে?' এবার যেন বিদ্রূপের খোঁচা মারল রুচিরা।

'এখানে আত্ম ইনক্লুডস আত্মীয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্থ—একটু বাড়িয়ে বলতে গেলে—আত্মীয়প্রতিষ্ঠা।'

'ও বাড়ি আপনার আত্মীয় হল কী করে?' এবারের খোঁচা যেন উপর-উপর নয়।

'ও বাড়ি মানে, আপনারা। তার মানে আপনাদের স্বার্থে—আপনারা যখন সমিতির লোক—শুধু আপনাদের জন্যে। এও বোধ হয় বাড়িয়ে বললাম।' রুচিরার চোখের মধ্যে চোখ রাখল শুভময়: 'কিছু মনে করবেন না, সত্য করে বলি, শুধু আপনার জন্যে।'

যা ভেবেছিল তা নয়, অন্য রকম মনে করল রুচিরা। বললে, 'না, না, আমি কেউ নই, আমি ও বাড়ির কেউ নই।'

'সে কি? ও বড়িঘর সব তো একদিন আপনার হবে।'

'আমার সেই সুদূর স্বার্থের কথা ভাবলেন বুঝি?' রুচিরার

চোখে আবার সেই বিদ্রূপের ঝিলিক ঃ 'সেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অস্পষ্ট ভবিষ্যতের কথা ? কিন্তু বর্তমানে—বর্তমানে আমার কী স্বার্থ ? বর্তমানে আমার কী আছে ? কিছু নেই। কিছু নেই।'

'কিছু নেই ?'

'না। আসল যে জিনিস সেই স্বাধীনতাই নেই।'

'আপনার স্বাধীনতা নেই ? আপনি বড়লোকের মেয়ে—'

'গালাগাল দিচ্ছেন নাকি ?' চলতে-চলতে এক পা থামল রুচিরা ঃ 'বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু নিজে তো বড়লোক নই।'

'তবু—'

'না, না, নেই স্বাধীনতা।' প্রায় কান্নার মত মুখ করল রুচিরা ঃ 'যেখানে খুশি আমি যেতে পারিনে, যার সঙ্গে খুশি মিশতে পারিনে। ঘরে-বাইরে পারিনে আন্তরিক হতে।'

'না, না, সে কী কথা !' শুভময় দাঁড়িয়ে পড়ল ঃ 'স্বাধীনতা চাই বৈকি। যে করে হোক, নিতে হবে স্বাধীনতা। সমস্ত সংগ্রামই তো এই স্বাধীনতার জন্যে।'

অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরল রুচিরা।

গোমরা মুখে এণাক্ষী জিগগেস করল ঃ 'কোথায় গিয়েছিলি ?'

এক বাক্যে উত্তর দিল রুচিরা ঃ 'কোথাও না।'

৬

এণাক্ষী বললে, মেয়ের এবার বিয়ে দাও।

বলতে হয় বললে কথাটা। কিন্তু ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে—ব্যাপারটা যে এত সোজা নয় এ কে না জানে! মেয়ের পছন্দই যে শেষ পর্যন্ত কাজ করবে তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু পছন্দটা খানিক ছন্দ মেনে চলে এটাই শুধু দেখবার। আকাঙ্ক্ষার বিমানটা ঘূর্ণিবায়ু বা বজ্রবিদ্যুতের উপর দিয়ে মসৃণ-স্নিগ্ধ অভিজাত আকাশে উঠে আসে এইটুকুই শুধু চালিয়ে আনার কৌশল।

'কজন পাত্রকে তো সেদিনকার জলসাতে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম।' বললেন জগৎপতি, 'তারা তো রুচিরাকে দেখে খুব ইমপ্রেসড। এবার ভাবছি দুয়েকজনকে বাড়িতে ডাকি চা খেতে। রুচিরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। তা থেকে—'

'তার থেকে তুমি শুভকে বলো ও ঠিক এক শাঁসালো পাত্র এনে দেবে।' লঘু শব্দেই হাসল এনাক্ষী : 'দেখতে-না-দেখতে কেমন সুন্দর ভাড়াটে এনে দিল। করিতকর্মা ছেলে—'

'তা বটে।' সায় দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার নাকচ করলেন জগৎপতি : 'কিন্তু পাত্রের ও বুঝবে কী!'

'হ্যাঁ' একটু বুঝি বা অনুকম্পার স্বর আনল এনাক্ষী : 'ছেলেটা ভারি গরিব। কাকার বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট হয়ে থাকে। লেখাপড়াও বেশি করতে পারে নি। চাকরিটাও সামান্য।'

'কিন্তু উচ্চাশা আছে।'

'গরিবের আবার উচ্চাশা! কুঁজোর চিং হয়ে শোবার চেষ্টা।' এণাক্ষী এবার একটু বা মিনতির সুর আনল : 'তুমি ওকে একটা কিছু পাইয়ে দিতে পারো না?'

'দেখি—' কোর্টের পোশাক পরে বেরুচ্ছেন জগৎপতি, ফিরলেন।

দু-একটা সূক্ষ্ম রেখা টানলেন মুখে। বললেন, 'আজকাল ও যেন একটু বেশি আসে।'

'সে তো আমার ফুটফরমাস খাটতে আসে।'

'তা আসুক আর যাক, ওকে আমাদের সকলেরই দরকার, কিন্তু যেন বসে না।'

'না, না, আড্ডা ও দেয় কোথায়?'

'কিন্তু এখন যেন রুচিরার ঘরে আছে মনে হচ্ছে।'

'সে ওর ঐ ছেলেদের জন্যে বই খাতা কিনতে দিয়েছিল, তাই বোধ হয় পৌঁছে দিতে এসেছে।'

বলতে-না-বলতেই বারান্দায় বেরিয়ে এল শুভময়। সিঁড়ির দিকে দ্রুত পায়ে ছুটতে ছুটতে বললে, 'অফিসে লেট হয়ে যাবে—'

জগৎপতি তাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিতে পারতেন, অনেকটা পথ পারতেন এগিয়ে দিতে। অনেকটা সময় তাহলে বাঁচত শুভময়ের, কিছুটা বা বাসভাড়া। কিন্তু জগৎপতি তাকিয়েও দেখলেন না। এমন ভাব করলেন যেন তিনি কোনো আইনের চিন্তায় বিভোর। যেন তিনি এখন এ সংসারেই নেই।

'দেখি কী আনল?' রুচিরার ঘরে ঢুকল এণাক্ষী।

এই শুধু জিনিস এনে দিয়েই এণাক্ষীর সুনজরে এসেছে শুভময়। এণাক্ষীর বিপুল সখ, এনে দিয়েছে নানা রকমের ফুলের চারা, পাখি-পাখাল, ঘর সাজাবার টুকিটাকি। কী নয়? পানের জরদা-মশলা পর্যন্ত। চাকর-বাকর ছাড়া একটা ছেলে নেই যে আদেশে-অনাদেশে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে পারে। অসামান্যে তো বটেই, সামান্যেও। জলের পাম্পটা খারাপ হয়েছে তো সমিতির সেক্রেটারিকেই ডাকো। নিওন লাইটের টিউবের বেলায়ও তাই। ভাড়াটের কী অসুবিধে তারও নিরাকরণে সমিতির সেক্রেটারি। সেক্রেটারিটা পরে সংক্ষিপ্ত হয়ে শুভময়। ময়-টা লয় হয়ে গিয়ে শেষে শুভ।

কিন্তু ঐ—কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরোলেই পাজি।

'বই-টই কী আনল?' রুচিরার ঘরে ঢুকল এণাক্ষী।

'এখনো আনেনি। লিস্ট নিয়ে গেল।'

হঠাৎ ঘরের মেঝের দিকে নজর পড়ল এণাক্ষীর। ও কী, কাঁচা কাদার দাগ! সর্বাঙ্গে জ্বলে উঠল এণাক্ষী: 'ওকে ঘরের বাইরে জুতো ছেড়ে আসতে বলতে পারিসনে?'

'তাকি কখনো বলা যায়?'

'খুব বলা যায়। যে ম্যানার্স জানে না তাকে শেখাতে হয় কানে ধরে। আর পায়ে ওর সেই শাণ্ডিল্য মুনির আমলের স্যাণ্ডেলই থেকে গেল চিরদিন। এতটুকু ভদ্রস্থ হল না!'

'আহা, মেঝেতে কাদা লাগলে কী হয়?' হাসতে চেষ্টা করল রুচিরা।

'জলে-ঝাঁটায় ধুয়ে মুছে ফেলতে হয়।'

'কদ্দিন ফেলবে?

'তার মানে?'

'এ বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'কে নেবে?' চোখে-মুখে আতঙ্কের ছবি ফোটাল এণাক্ষী।

খিলখিল করে হেসে উঠল রুচিরা: 'এ বাড়ি ইস্কুল হয়ে যাবে।'

রসিকতাটা যেন একটু হৃদয়ঙ্গম হল এণাক্ষীর। 'তোর বস্তি-ক্লাশটা তোর এই দোতলার ঘরেই চালাবি নাকি?'

'না, আপাতত নিচের ঘরে বসাব। তবে পরে, কালক্রমে কী হয় কিছু বলা যায় না।' মাকে ভয় পাইয়ে দিতে মজা লাগে বলে রুচিরা আবার ঘোর-ঘোর মুখ করল।

'কী হবে কালক্রমে?'

'ভূমিকম্পও তো হতে পারে। চার দিক থেকে কী সব উঠছেন গগনচুম্বীরা—ঔদ্ধত্যের কালাপাহাড়ের দল। যিনি সর্বংসহা তাঁরও সহ্যের সীমা আছে। একদিন সব পড়বে হুড়মুড় করে—'

'সেদিনও শেষ পর্যন্ত জল আর ঝাঁটারই দরকার হবে।' চাকরের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ল এণাক্ষী।

কিন্তু নিচের ঘরেও ক্লাশ বসাতে দিতে আপত্তি জগৎপতির।

'এগুলোকে পেলি কোত্থেকে ?' কোথায় মমতায় আকৃষ্ট হবেন, তা নয় যেন শিউরে উঠলেন।

আশেপাশেরই বস্তির ছেলেমেয়ে। এমনিতে ফুল চুরি করে নিয়ে যায়, ধরা যায় না, কিন্তু সেদিন একটা কাটা ঘুড়ির উদ্দেশে এক দঙ্গল ঢুকে পড়েছিল বাগানে। অতি-উৎসাহে দেখতে পায়নি গেট কখন বন্ধ করে দিয়েছে রুচিরা। তা ছাড়া ঘুড়িটা প্রথম কে ধরেছে তাও রুচিরাকে বিচার করে দেওয়া দরকার। কই ঘুড়ি কই ? শুধু কঙ্কাল দুটো কাঠি পড়ে আছে। এ নিয়ে আবার কান্নাকাটি, মারপিট। পানের দোকান থেকে এক গোছা ঘুড়ি কিনে আনাল রুচিরা। চুরি-করা ফুলের চেয়ে এ অনেক ভালো। কাল আবার এলে খাবার দেবে। কদিন খাবার দিয়ে পরে শার্ট-ফ্রক। এবার আস্তে আস্তে বই-খাতায় এস। অ-আ শেখ ! এক-দুই শেখ। এক পয়সা খরচ লাগবে না।

গোড়ায় গোড়ায় বাঙালি। পরে হিন্দি মাস্টার এনে হিন্দি।

বাপ-মারা খুশি। মহাখুশি। বড়লোকের বাড়ির খেয়াল, ভালো ছাড়া মন্দ হবার কী আছে। লেখাপড়া কিছু হোক না হোক, টিফিন তো পাবে।

ছাত্রছাত্রীর চেহারা দেখে জগৎপতির মোটেই আহ্লাদ হল না। বললেন, 'এক রাজ্যের নোংরা এ বাড়িতে কেন ?'

'সুরু করতে হল ঘর তো একটা কোথাও চাই।' রুচিরা বললো ঠাণ্ডা হয়ে ঃ 'সমিতির অফিসে জায়গা কোথায় ?'

'তা হলে আমার বাড়ির এ নিচের ঘরটা সমিতিরই সামিল হল ?'

'মন্দ কী ! তুমি সমিতির প্রেসিডেন্ট, জনসেবার খাতিরে দিলেই

না হয় একটা ঘর ছেড়ে। আমাদের নাটকের রিহার্সেলেরও একটা ভালো ঘর নেই। ও ঘরটা সে কাজেও লাগতে পারবে।'

'রিহার্সেলের জন্যে হল-ঘরটাই তো ছেড়ে দিতে পারব।' কিন্তু বাড়ির মধ্যে এই নোংরা বস্তি-বস্তি ভাবটা ভালো লাগছে না।'

'সেবা তো নোংরা ঘেঁটেই করতে হবে বাবা। যে সুস্থ আছে, পরিচ্ছন্ন আছে তার সেবার কী দরকার!'

'আমার সেবার আইডিয়া এ রকম ছিল না।'

'তোমার আইডিয়া ছিল মুখেই জগৎ মারবো, কাজে কিছু করবো না।'

'অন্তত তুমি করবে না। তুমি উপরে থাকবে, একটি নাম হয়ে থাকবে, যাকে বলে ফিগারহেড হয়ে থাকবে। আর য়্যাকচুয়াল ফিল্ডে কাজ করবে গরিব গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা, যারা র‍্যাঙ্ক এণ্ড ফাইল—'

'তার মানে কাজের বেলায় ওরা আর ক্রেডিট নেবার বেলায় আমি?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটাই হচ্ছে পলিটিক্স।'

'অন্য মেয়েরা যা পারবে তা আমার করতে বাধা কী!'

'বাধা অনেক। প্রধান বাধা আভিজাত্য। শালীনতা!'

রুচিরা চুপ করে রইল।

'আমি যদি কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে টাকা দিই, চ্যারিটি করি, তা হলে কি তাতে আমারও সেবা করা হল না?' জগৎপতি একটু পায়চারি করে নিলেন: 'কুষ্ঠ হাসপাতালে আমার শুধু দান করলেই চলবে না, হাসপাতালে গিয়ে নিজের হাতে আমাকে রুগীর সেবা করতে হবে?'

'কিন্তু আমার যখন টাকা নেই তখন আমি কী দেব?' নত চোখ তুলল না রুচিরা: 'আমার পক্ষে শ্রম দেওয়া ছাড়া আর কী আছে?'

'না, তুমি শুধু নাম দেবে, ঔজ্জ্বল্য দেবে।'

'নাইট স্কুল করবার তো তুমি পক্ষপাতী ছিলে—' চোখ তুলল রুচিরা।

'সে তো এখনো আছি। তাই বলে তুমি সে স্কুলে মাস্টারি করবে নাকি?'

'আমি তাহলে কী করব?'

'তুমি শুধু মোড়লি করবে। উপর-উপর ফোঁপর-দালালি করবে।'

আবার চুপ করল রুচিরা।

'একটা স্কুল অর্গানাইজ করতে হলে অনেক রকম লোক লাগে। তাদের সবাই আর মাস্টার নয়, দরোয়ান চাপরাশি নয়। কেউ কেউ বা পরিচালক-গোষ্ঠীর মধ্যে। কারু কারু বা সেক্রেটারিয়েট ডিউটি। তুমি তাদের কেউ হবে। শেকড়ে যাবে কেন, পল্লবে থাকবে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা কী ভাবে প্রতিষ্ঠান চালায় দেখ না। তুমিও তেমনি কাগজে-কলমে থাকবে, একেবারে কোদাল-শাবল ধরবে কেন? বরং মাস্টার রাখবে মাইনে দিয়ে, নিজে হবে কেন? জাহাজের যে সারেঙ সে কি খালাসীর কাজ করে?'

বাড়ির স্কুল তুলে দিল রুচিরা।

'ও সব কী করব দিদিমণি?' বই-খাতা শ্লেট-পেন্সিল যা যা দেওয়া হয়েছিল তাদের দিকে লক্ষ্য করল ছেলেমেয়েরা : 'রেখে যাব?'

'না, নিয়ে যা। রেখে দিস যত দিন পারিস।' তারপর নিজের মনে বললে, 'যদি কোথাও কোনোদিন একটা আগুনের ফিনকি জ্বলে ওঠে।'

তারপর একদিন জগৎপতির সামনে গিয়ে দাঁড়াল রুচিরা। বললে, 'আমি একটা চাকরি নিলে কেমন হয়?'

'কোথায় চাকরি?' কাজের মধ্যে আছেন বলে জগৎপতিকে অন্যমনস্ক শোনাল।

'পাইনি এখনো। চেষ্টা করে দেখা যায়।'

'আগে তোমার রেজাল্টটা বেরুক।'

'চুপচাপ বসে আছি।' নিঃস্বের মত বললে রুচিরা।

চুপচাপই থাকো, নিজের স্তব্ধতা দিয়ে তাই বোঝালেন জগৎপতি।

স্বাধীনতা কি চেয়ে-চিন্তে হয়, কাকুতি-মিনতি করে? জোর করে নিতে হয় ছিনিয়ে। নিজের পথ নিজে কাটতে হয়। অস্ত্র শুধু নিজের প্রতিজ্ঞা।

চলে যাচ্ছিল রুচিরা, ডাকলেন জগৎপতি। বললেন, 'তোমার যদি টাকার দরকার হয়, তোমার মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারো।' নীরবে একটু বুঝি বা বিবেচনা করলেন: 'হ্যাঁ, একশো টাকা।'

'দরকার নেই।'

এর কদিন পরেই এক সন্ধেয় জগৎপতি অরিন্দমকে চায়ে নেমন্তন্ন করে আনলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন রুচিরার সঙ্গে।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল অরিন্দম। বললে, 'বাঃ, আপনার টেস্ট আছে। নাম তো রুচিরা, তাই রুচি থাকবে তাতে আশ্চর্য কী।'

এঞ্জিন থেকে আর কত কবিত্ব বেরুবে, হাসল রুচিরা। বললে, 'কেন, আমি কী করেছি?'

'প্রকাণ্ড কাণ্ড করেছেন—তার মানে, আপনি কিছুই করেন নি। মানে', টাই নিয়ে একটু টানাটানি করল অরিন্দম: 'একদম সাজেন নি। আমি আসব, আমি এসেছি জেনেও একটুও ফিটফাট হবার চেষ্টা করেন নি। যেমনটি ছিলেন তেমনটিই আছেন। এ যে কত বড় রূপ, স্বভাবে সুন্দর হওয়া—' ধীরে ধীরে বসল অরিন্দম।

'আপনার জন্যে রান্না করছিলাম যে।' বাধা দিল রুচিরা।

'সে কি, আপনি রাঁধতেও জানেন নাকি?'

সব রান্না জানলে বোধ হয় অভিজাত দেখায় না, সারা দিন হেঁসেলেই কাটাতে হয়, তাই জগৎপতি তাড়াতাড়ি সংশোধন করলেন ঃ 'কয়েকটা স্পেশ্যাল রান্না শিখেছে—ঐ যে কোন কোম্পানি থেকে শিখিয়ে যায় !'

'কত আপনার গুণ !' তন্ময়ের মত বলতে লাগল অরিন্দম ঃ 'সেদিন কী গর্জাস নাচলেন ! কী সুপার্ব ফিগার আপনার ! একবার মনে হল প্যান্থার, একবার মনে হল পাইথন—'

'আপনি এঞ্জিনিয়র, মোটরগাড়ি কি ট্রেন কি এরোপ্লেন মনে হল না ?' লঘু করে দিতে চাইল রুচিরা।

'তারপর গানও তো শুনলে।' মনে করিয়ে দিলেন জগৎপতি।

'এক কথায় সুইট।' সোফায় ঢেউয়ে উঠল অরিন্দম ঃ 'ছাড়ব না। গান শোনাতেই হবে।'

'তারপরে আরো আছে।' জগৎপতি প্রগাঢ় হলেন ঃ 'সোশ্যাল সার্ভিসে ইণ্টারেস্টেড।'

'সে তো আজকাল একটা বিরাট কোয়ালিফিকেশান।'

মুখ'চোখ জ্বলে উঠল রুচিরার। বললে, 'যাই আপনার চা-টা নিয়ে আসি।'

'না, এই যে আমি এনেছি।' দরজার বাইরে এণাক্ষী ঘোষণা করল।

প্রথমে খাবারের পরিমাণ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাল অরিন্দম। পরে সোশ্যাল সার্ভিস বা সমাজসেবার কথা তুলল। বিলেতে কী রকম কী দেখে এসেছে তার বিবরণ দিলে। এই যে সে দিন জলসাতে এসেছিলে, যাতে রুচিরা নাচল গাইল প্লে করল, সেও একটা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। জগৎপতি মনে করিয়ে দিলেন। আর, জানো, সে প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি রুচিরা।

জয়েণ্ট সেক্রেটারি ! রুচিরার ইচ্ছে হল প্রতিবাদ করে। কিন্তু কী হবে প্রতিবাদে। কে বা বলছে কাকে বা বলছে।

'আমরা সে সমিতির মেম্বর হতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' উচ্ছ্বসিত হলেন জগৎপতি। 'আমার এলাকায় যখন এ প্রতিষ্ঠান তখন তার উন্নতি-সমৃদ্ধি চাই বইকি একশোবার। আর তোমরা এসে ঢুকলেই ওর 'টোন'টা একটু সুস্থ হয়, সম্ভ্রান্ততা বাড়ে।'

'ঠিক, ঠিক। আজই মেম্বর হয়ে যাব।'

'তার আগে সমিতির নিয়মাবলীটা একটু দেখে নেবেন না?' অরিন্দমের চাঞ্চল্যকে একটু সংযত করতে চাইল রুচিরা।

'আপনিই তো সেক্রেটারি, শুধু আপনাকে দেখে নিলেই তো হবে।' মনিব্যাগ বার করল অরিন্দম: 'মোট কত দিতে হবে তাই বলুন।'

'সে পরে হবে খন। আপনি আগে হাত লাগান।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুরু করে দাও।' জগৎপতি তাড়া দিলেন।

'আপনি—আপনারা?'

'এ শুধু আপনার জন্যে পার্টি। আপনি সভ্য হবেন সেই সম্মানে। আপনি খাবেন, আমরা খাওয়াব।'

'বা, তা কি হয়?' প্লেটগুলো প্রতিপক্ষদের দিকে ঠেলে-ঠেলে দিল অরিন্দম। 'আমরা সবাই সভ্য।'

'হ্যাঁ, সমস্তটাই ইনফরম্যাল। তাই যে পারো যা পারো তুলে নাও।' একটা ঘরোয়া আত্মীয়-পরিবেশ এনে ফেললেন জগৎপতি। এণাক্ষীকেও ইঙ্গিত করলেন বসে পড়তে।

'কিন্তু আপনি কিছু নিচ্ছেন না?' রুচিরার দিকে চোখ তুলল অরিন্দম।

'বা একজনকে তো পরিবেশন করতে হয়!'

'আহা, এর আবার পরিবেশন কী!' এণাক্ষী ভ্রূকুটি করল: 'তুইও বোস না ও পাশটাতে।'

'আমি পরে। আমি সকলের শেষে। সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।' লঘু করে বলতে গিয়ে অলক্ষ্যে বুঝি সুরের একটু টান দিয়ে ফেলল রুচিরা।

'ভালোই, আপনার মুখে যে কোনো খাবার নেই। আপনার মুখ-দাঁত সব ফ্রি আছে।' অরিন্দম খাবারভরা মুখে বললে, 'আপনি তাহলে গান পরিবেশন করুন।'

'সেইটেই শ্রেষ্ঠ খাবার।' টিপ্পনী জুড়লেন জগৎপতি : 'সকল মিষ্টির সেরা মিষ্টি।'

'ঠিক, ঠিক।' সায় দিল অরিন্দম। যেন এটা তার নিজেরই বলা উচিত ছিল এমনি আপশোসের ভঙ্গি করলে।

'যে রকম নাকে-মুখে খাচ্ছেন, কান দুটোও ফ্রি আছে কিনা সন্দেহ হচ্ছে।' রুচিরা এবার শব্দ করেই হাসল।

'আছে, আছে।'

মুখ মেঘলা করে থাকেনি, পরিহাসের স্বরে কথা কইছে রুচিরা, এতেই এণাক্ষী আর জগৎপতি খুশি কিন্তু এত সহজেই সে গান ধরে বসবে এ প্রায় কল্পনার অতীত। তা হলে অরিন্দমকে তার অপছন্দ হয়নি। মোটকথা, পাখিকে তার অনুকূল আকাশ দিলেই উড়তে পারে। এবার একটি অনুকূল বৃক্ষ দিলেই বসতে পারে বিশ্রামে। একটু যেন বা হালকা হলেন দুজনে।

এমন সময়, চারপাশে বেনিয়মের হাওয়া, সেই ঘরে ঢুকে পড়ল শুভময়। গায়ে সেই বুকখোলা পাঞ্জাবি, পায়ে শাণ্ডিল্যমুনির স্যাণ্ডেল।

কাঁচের বাসনের শব্দ, টুকরো-টুকরো কথা, হঠাৎ স্তব্ধতা, তারপরে গান—সহজেই আকৃষ্ট হবার মত। তাছাড়া এ অভিনব পরিবেশে হঠাৎ কোনো কাজের জন্যে শুভময়কে দরকার পড়তে পারে।

কিন্তু হঠাৎ জগৎপতি ধমকে উঠলেন, : এখন নয়। পরে।'

তবু এক মুহূর্ত ঝুলে থেকে নিতান্ত অনিচ্ছায় সরে গেল শুভময়।

'দাঁড়াও, কথাটা সেরে আসি।' জগৎপতি অনুসরণ করলেন। পাছে আবার না চলে আসে। রসভঙ্গ ঘটায়।

গান থেমে গেছে রুচিরার।

'কে?' জিগগেস করল অরিন্দম।

যেন দেখতে পায়নি এমনি সরল অনুমানের ভাব করল এণাক্ষী। বললে, 'কোনো মক্কেল-টক্কেল হবে হয়তো।'

তক্ষুনি ফিরে এলেন জগৎপতি। অরিন্দমের কৌতূহলকে নিরস্ত করবার জন্যে বললেন, 'সমিতির এই একজন মেম্বর। নেক্সট মিটিং-এর ডেটটা ঠিক করতে এসেছিল—'

'এই ভদ্রলোক সেদিনকার জলসাতে য়্যাকটিং করেছিল না? অরিন্দম বললে, 'চমৎকার করে কিন্তু।'

'হ্যাঁ, য়্যাকটিংটা বেশ শিখেছে।' জগৎপতি টিপ্পনী জুড়লেন।

'এ কি, আপনার গান কী হল!' রুচিরাকে মনে করিয়ে দিল অরিন্দম।

রুচিরা তখন একটা প্লেট নিয়ে পড়েছে। বললে, 'দেখছেন না মুখে খাবার পোরা।' সেই অবস্থায়ই হাসল: 'এখন আর সভ্য নই, অন্যরকম হয়ে গিয়েছি।'

তারপর কথায়-কথায়, শেষ ক্ষেপে, প্রস্তাব এল, অরিন্দমের নতুন ওয়ার্কসাইটে বেড়াতে গেলে কেমন হয়।

'চলুন আমার গাড়ি আছে।'

জগৎপতি কী করে যাবেন, তাঁর কত কাজ। আর এণাক্ষীর যদি যেতে হয় বাড়ির গাড়িই তো তৈরি। রুচিরার তবে জায়গা হয় কোথায়?

তাই এণাক্ষী বললে রুচিরাকে, 'তুই যা।'

অরিন্দমের উৎসাহে তাতে মন্দা পড়বার কথা নয়, বললে, 'তাই চলুন।'

'মন্দ কী। চলুন।' রুচিরা পা বাড়াল।

'আমরা পরে না হয় একদিন যাব।' পিছন থেকে বললেন জগৎপতি।

'কিন্তু আপনি এমনি ভাবেই যাবেন?' একটু কি ইতস্তত করল অরিন্দম?

'না, না, একটু ফিটফাট হয়ে যা।' এণাক্ষী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রহার হানলেন।

'বা, কেন, দিব্যি আছি। তখন যে বললেন, আটপৌরে থাকাই অসাধারণ থাকা, স্বভাবে সুন্দর থাকা—'

'ও, বলেছিলাম নাকি? চলুন তাহলে।'

ড্রাইভার নেই, অরিন্দমই হুইল ধরল। কাজেকাজেই সামনে বসতে হল রুচিরাকে।

জগৎপতি আর এণাক্ষী চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। অনুকূল দেশ পেলে নদী আপনা থেকেই ঢল নামায়।

'আপনি বেশ ফ্রি—'

'ফ্রি মানে কী?'

'স্বাধীন। সংস্কারমুক্ত। তাই না? দিব্যি চলে এলেন। সাজগোজ প্রসাধনেরও তোয়াক্কা করলেন না—'

'হ্যাঁ, আপনাকে একটা অনুরোধ করতে এলাম।'

'অনুরোধ? কী?'

'আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেন?'

'চাকরি?' অবিশ্বাস্য হেসে উঠল অরিন্দম: 'আপনার চাকরির কী দরকার!'

'দরকার—ঐ যে বললেন ফ্রিডম—তার জন্যে।'

'বাজে কথা।' একটু বুঝি বা গম্ভীর হল অরিন্দমঃ 'অবশ্যি বাপের ঘরে মেয়ের ফ্রিডম নেই। তার ফ্রিডম স্বামীর সংসারে। আর সেই মনোমত সংসার আপনি তো ইচ্ছে করলেই লুফে নিতে পারেন। রূপে গুণে অর্থে—'

'রাখুন, আমার মত দীনহীন খুব কম আছে—

হাসিতে আবার ফেটে পড়ল অরিন্দম। 'দাঁড়ান, আপনার বাবাকে বলছি।'

'ঐ তো আমার স্বাধীনতার নমুনা।'

'বেশ তো বলব না। আপনার রেজাল্ট বেরুচ্ছে কবে?'

ক-দিন পরেই রেজাল্ট বেরুল।

শুভময়কে ডাকালেন জগৎপতি! বললেন, সমিতি এবার তার জয়েণ্ট সেক্রেটারিকে একটা সম্বর্ধনা দিক। খুব ভালো কথা, সব এক তন্ত্রীতে শিহরিত হবে। হ্যাঁ, সেই উপলক্ষে আমি একটা স্টিমার পার্টি য়্যারেঞ্জ করছি। সব খরচ আমার। ভীষণ আনন্দের কথা। তোমরা সমিতির তরফ থেকে একটা জলসা বসাও। যিনি পাশ করেছেন, যাঁর জন্যে সংবর্ধনা, তিনি নাচবেন-গাইবেন তো? হ্যাঁ, বিশিষ্ট কজন অতিথি-অভ্যাগত নিমন্ত্রণ করব, তাঁদের খাতিরে রুচিরাকেও নামতে হবে আসরে। লেগে যাও জোগাড়যন্ত্রে। ঢোল পিটিয়ে দাও।

স্টিমার পার্টিটা জমল না।

আর সবই হল, রুচিরা নাচল তো না-ই গানও গাইল না। কত পাহাড়-গলানো অনুরোধ, টলল না রুচিরা। বললে, নিদারুণ মাথা ধরে আছে, মন-মেজাজ তিরিক্ষি।

সর্বক্ষণই দেখছে সম্ভ্রান্তের দল থেকে অসম্ভ্রান্তের দলকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে। যদি খাবার কিছু কম পড়ছে সে ঐ অসম্ভ্রান্তদের পাতে। চা-সিগারেট যত যার খুশি সম্ভ্রান্তরাই পাবে, অসম্ভ্রান্তরা

সকলেই পেয়ালা-পিরিচ আশা কোরো না, রুমাল দিয়ে ধরে খুরি করে খাও।

আর জগৎপতি শুভময়কে এমন ভাবে খাটাচ্ছেন যেন খিদমদগারিই তার পেশা।

অথচ এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। খাটছে না তো, প্রাণের স্বাস্থ্যে চারদিকে উথলে পড়ছে।

রুচিরার মনে হয় ভদ্রতার অবশেষ জামাটাই বা শুভময় গায়ে রেখেছে কেন? রীতিমত রিক্তগাত্র মজদুর হয়ে যাক। ওদের শালীনতাকে ত্রস্ত-ব্যস্ত করুক।

'নতুন তাশটাও ওদের দেবেন নাকি?' রুচিরা আপত্তি করল।

'ওরা অতিথি।'

'ওরা সবাই সমিতির মেম্বর হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তিথি অতিথি নেই, সবাই সমান, নো ডিসক্রিমিনেশান—'

'ওদের দিচ্ছি ওদের কিছু অধিকার আছে বলে নয়, ওদের প্রতি কৃপা করে।'

ওদের দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকাতে চেষ্টা করল রুচিরা।

অরিন্দম বাড়িতে এসে গিয়েছে, তার পরে কণাদকে ডাকা হবে। আর ঐ বুঝি নতুন ব্যারিস্টার পল্লব বাগচি। কণাদের পর চায়ে পল্লব আসবে। আর পল্লবের পাশে তিলক বিশ্বাস, কোন এক সদাগরী ফার্মের অফিসর। পল্লবের পরে হবে তিলকের নিমন্ত্রণ।

কোন অরণ্যে গেলে এসব দ্বিপদের থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়?

ফিরতি পথে বাস-এ আসতে-আসতে রুচিরা শুভময়কে বললে, 'ওদের প্রতি আপনি যেমন কৃপা দেখাচ্ছেন, শেষকালে ওরা না সমিতি ক্যাপচার করে বসে!'

শুভময় তাচ্ছিল্যের হাসি-হাসল।

'সমিতির 'টেরিটরি' কতটা হবে কিছুই বলা নেই।' রুচিরা

মুখচোখ আবার চিন্তিত করল ঃ 'তাই যে কোনো ওয়ার্ডের লোক এসে ভিড় জমাতে পারে। আমাদের পাড়াকে দিতে পারে ডুবিয়ে।'

বিন্দুমাত্র ভাবিত নয় শুভময়। বাস থেকে নেমে যাবার সময় হাসিমুখে বললে, 'যতক্ষণ আমি-আপনি একত্র আছি কারু সাধ্যি নেই আমাদের হটাতে পারে।'

৭

শুভময় আর রুচিরা একত্র হয়ে কাজে বেরুল।

কথাটা জগৎপতির কাছে চাপা থাকল না। রুচিরাকে ডেকে জিগগেস করলেন ঃ 'তোরা নাকি বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরছিস ?'

অস্বীকার করবার কী আছে ? নাইট স্কুল খুললে শ্রমিকদের মধ্য থেকে কত নম্বর ছাত্র পাওয়া যাবে তারই একটা হিসেব নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। স্কুল খুলতে এখনো অনেক দেরি।

'তা হোক। তাতে তোর কেন মাথাব্যথা ?'

সমিতির খাতায় আছে, জগৎপতির সইয়ের উপরে, বস্তিতে বস্তিতে নাইট স্কুল খোলার কথা। যদি সে সন্ধানে সেক্রেটারিকে যেতে হয় রুচিরাকেও জয়েণ্ট হিসেবে সঙ্গী না হয়ে উপায় কী।

'ও বস্তির লোক, ও থাক বস্তিতে। তুই না।' হুঙ্কার ছাড়লেন জগৎপতি।

'বস্তিই তো শক্তির রূপ। তোমার ভোটের সারনাথ।'

'আমি সমস্ত ভোট পয়সা দিয়ে কিনে নেব। নাইট স্কুল-টুল সব কায়দার কথা, নইলে আমি বস্তিতে গোপনে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পরে প্রত্যক্ষ লরিবোঝাই রিলিফ নিয়ে যাব, লুটে নেব সমস্ত ভোট। তার জন্যে তোকে এ নোংরার রাজ্যে গিয়ে দালালি করতে হবে না।'

শুভময়কে ডাকালেন জগৎপতি।

'শোনো, ওসব বস্তি-টস্তিতে তুমি রুচিরাকে সঙ্গে নিও না।'

যে আজ্ঞে, এই রকমই একটা উত্তরই জগৎপতি আশা করেছিলেন, কিন্তু শুভময় একটা অন্যরকম সুর বার করল। বললে, 'আমি কি আর নিই! উনি নিজের থেকেই আসেন!'

'ও একা-একা যায়, তার তুমি কী করবে!' জগৎপতি অন্যদিকে

তাকালেন ঃ 'কিন্তু তোমরা একসঙ্গে গেলে কী রকম যেন দেখায় !' কথাটা কঠিন হয়ে গেল টের পেয়ে একটু বা পরিহাসের আমেজ আনলেন ঃ 'পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সূর্পনখা আর পুরুষেরা খরদূষণ ।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল শুভময়। তার মানে তার সঙ্গটা বরণীয় নয়। সে নিচুতলার লোক। সে অকুলীন।

কিন্তু কথাটা শুভময় সুন্দর ঘুরিয়ে নিল। বললে, 'হ্যাঁ, তা মিথ্যে নয়। শত হলেও মিস চ্যাটার্জির রেপুটেশানটা দেখতে হয়। তবে, উনি রিলিফে যান আর না যান, মেয়েরা মেয়ের নিন্দে করবেই।'

'তা করুক। অঙ্গার শত ধুলেও তার মালিন্য যাবে না। শত লেখাপড়া সত্ত্বেও মেয়ে মেয়েই থেকে যাবে।'

'তা হলে এক কাজ করুন। ওঁকে ক্লাবটাই ছেড়ে দিতে বলুন। আর,' পরম হিতৈষীর মুখে বললে, 'আর একটা ওকে গাড়ি কিনে দিন।'

তা হলে বোধহয় এঁর সুবিধে হয়! কিন্তু তেমন কোন ভ্রূকুটি না করে জগৎপতি সরল মুখ করে বললেন, 'কই গাড়ির কথা তো কিছু বলছে না।'

'গাড়ি হলেই আর ওসব গলিঘুঁজিতে ঢুকতে পারবেন না। আপনা থেকেই রিলিফের থেকে মুখ সরিয়ে নেবেন।'

'সে চেষ্টা আমি দেখছি। এদিকে তুমি—'

'নইলে ক্লাবের থেকে নাম কাটিয়ে নিন।'

'সে ভারি ড্র্যাস্টিক হবে। শুধু তুমি যদি ওকে একটু পাত্তা কম দাও, সমীহ কম করো, এড়িয়ে চলো—'

'এত বড় একজন গুণী শিল্পী—' প্রশংসার কথাটা কী ভাবে বলবে বুঝতে পারল না শুভময়।

'কিন্তু সেইসঙ্গে ও যে আবার ধনী—বড়লোকের মেয়ে। কারু কারু মতে শুধু বড়লোক হওয়াটাই তো একটা অপরাধ। ওকে যদি

সেই বড়লোক হওয়ার দরুন খোঁটা দাও, ঠাট্টা করো, যদি ওর আন্তরিকতায় সন্দেহ দেখাও—'

'বড়লোক।' কি রকম অদ্ভুত চোখে তাকাল শুভময়।

'তাছাড়া আবার কী। বড়লোকের মেয়ে তো বটে।' জগৎপতির উকিলি-গলায় এতটুকু আটকাল না : 'আর বড়লোক মানেই তো স্বার্থান্বেষী। এসব বলে ওকে টিটকিরি দেবে। ওকেই বা তোমরা রেহাই দেবে কেন? ওর এই রিলিফের ভাবটা যে একটা স্টাণ্ট মাত্র সেটাই বা দেবে না কেন বুঝতে?'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব।' সুন্দর ঘাড় হেলাল শুভময় : 'মানে, ওঁকে বোঝাব ওঁর সত্যিকার অবস্থা—মানে ওঁর সামাজিক অবস্থা—'

'হ্যাঁ, তুমিই পারবে।' জগৎপতি দিব্যি শুভময়ের কাঁধে হাত রাখলেন, দিব্যি হাসলেন : 'আমার-তোমার ভবিষ্যৎ থাক বা না থাক, ওর তো আছে। তুমি তো সেটা বোঝো—'

'কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে।' কাঁধ থেকে হাতটা খসিয়ে দিল শুভময়। বললে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

টেবিলের ড্রয়ার টানলেন জগৎপতি। 'আর তোমাদের সেই হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারির জন্যে টাকা চাই বলছিলে—'

'সে আরেক দিন হবেখন।' দ্রুত বেরিয়ে গেল শুভময়।

তারপর যথারীতি কণাদ গুহের চায়ে নেমন্তন্ন হল। রুচিরা বললে, 'আমার কজন বন্ধুকে ডাকি।'

'তোর আবার বন্ধু কে?' এণাক্ষী ফোঁস করে উঠল।

'বা, জয়শ্রী, শ্রাবণী, নিবেদিতা—'

'সর্বনাশ!' প্রায় পথে-বসার মত মুখ করল এণাক্ষী।

'শুধু মেয়েদের নাম করলাম, তাতেই সর্বনাশ?'

'শেষকালে ওদের কাউকে পছন্দ করে বসুক।' এণাক্ষী হাঁসফাঁস

করে উঠল ঃ 'না, এতে বাইরের লোকের পাট নেই। এটা কোনো জলসা বা স্টিমার-পার্টি নয়।'

ওপাশ থেকে বলে উঠলেন জগৎপতি ঃ 'এটা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার, কনফিডেনশিয়্যাল—'

ক্লাবে নয়, একেবারে শুভময়ের বাড়িতে গিয়ে পাকড়াও করল রুচিরা।

'কী আশ্চর্য, আপনি এখানে কেন? সমিতিতেই তো দেখা হতে পারত। কিংবা ওখানে কাউকে খবর দিলেই তো—'

'না, না, ব্যাপারটা ঘরোয়া আর কনফিডেনশিয়্যাল—'

'সেটা মন্দ নয়।' শুভময় হাসল। 'কিন্তু এখানে, এ বাড়িতে আপনাকে আমি বসাই কোথায়?'

বাড়িটার দিকে নিজেরও অলক্ষ্যে তাকাল রুচিরা। বললে, 'না, বাড়ি লাগবে না, বসতে আসিনি, আপাতত পথে নেমে এলেই চলবে।'

'সে তো খুব আইডিয়াল অবস্থা।' রোয়াক থেকে পথে নেমে এল শুভময়। 'বলুন কী করতে হবে?'

'পরশু বিকেল চারটের সময় আমাদের বাড়িতে আপনার চা-খাবার নেমন্তন্ন।'

'চা খেতে হবে?' হতাশের মত চেহারা করল শুভময় ঃ 'মোটে এইটুকু? আমি ভেবেছিলাম বুঝি লাফ দিয়ে সমুদ্র পেরোতে বলবেন।'

'সে তো কনস্ট্রাকটিভ কিছু হল।' রুচিরা ধারালো চোখে হাসল ঃ 'আমি ডাকব আপনাকে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে দিতে। তার মানে, ঠিক চা খেতে নয়, চায়ের আসরটা ভণ্ডুল করে দিতে।'

উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল শুভময়। বললে, 'আমি পণ্ড করতে ভণ্ডুল করতে ওস্তাদ। কিন্তু ব্যাপার কী?'

ব্যাপারটা বললে রুচিরা। বললে, 'ভাব দেখাবেন, আপনাকে কেউ ডাকেনি, আপনি নিজের থেকেই এসেছেন। আর যদি একবার

এসেছেন, মাঝপথে আপনি চলে যেতে প্রস্তুত নন। আপনি উঠবেন না, নড়বেন না, লোকটাকে কিছুতেই দেবেন না নিভৃত হতে।'

'মাত্র এইটুকু? জিনিসপত্র কাপ-গ্লাস কিছু ভাঙতে-টাঙতে হবে না?'

'না, দরকার হবে না। শুধু জীবনের কৃত্রিম শালীনতার উপর একটা উপহাসের মত উপস্থিত থাকবেন।'

'খুব পারব। আপনার জন্যে সব পারব।' খোলা বুকে একবার বুঝি বা হাত রাখল শুভময়।

'জানি পারবেন। তারপরে আরো লোক আসবে—তিলক আসবে, পল্লব আসবে, তাদেরও ঠেকাবেন।'

'কিছু ভাববেন না।' শুভময়ের কপালের কাছেকার কটা কালো চুলের গুছি হাওয়ায় দুলে উঠল। 'মিলিটারিকেই ঠেকিয়েছি, আর এ তো তৃণ-পল্লব!'

শনিবার, বিকেল চারটেয় কণাদকে নিয়ে আসর প্রায় সরগরম হয়ে উঠছে এমনি সময় পর্দা সরিয়ে হঠাৎ শুভময় ঘরে ঢুকল। আজকের জামা কাপড় সচরাচরের চেয়েও ম্লান, স্যাণ্ডেলের একটা স্ট্র্যাপ বোধহয় খানিক আগেই ছিঁড়ে গিয়েছে। হুল্লোড়ের মত করে বললে, 'বাঃ, এই যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। চমৎকার।' মুহূর্তমাত্র দেরি বা দ্বিধা না করে একেবারে টেবলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল: 'শোনপাপড়ি? এ আমার খুব প্রিয়।' বলেই বলা-কওয়া নেই একটা তুলে মুখে পুরল।

সর্বশরীরে জ্বলে উঠল এণাক্ষী। 'এ অসময়ে তুমি কোত্থেকে?'

'দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে।' গুঁড়ো গুঁড়ো পাপড়ি ফেলতে-ফেলতে শুভময় বললে।

'ও! তোমার সেই ডিসপেনসারির চাঁদাটা বুঝি?' জগৎপতি উঠলেন চেয়ার ছেড়ে: 'এসো। পাশের ঘরে এসো।'

'চাঁদা পরে হবে। আগে এই উপস্থিতকে সারি।' সন্দেশের স্তূপের দিকে হাত বাড়াল শুভময়ঃ 'আজ আর মক্কেল সেজে কেটে পড়তে রাজি নই।'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল রুচিরা। বললে, 'বসুন। এই নিন স্যাণ্ডুউইচ নিন।' আর লোক পেল না, প্লেটটা শুভময়ের দিকেই বাড়িয়ে ধরল।

'মিষ্টিতেই আমার বেশি লোভ।' প্রায় বর্বরের মতই দাঁত দেখাল শুভময়। 'এখনো অসভ্য আছি। দাঁত এখনো ভালো আছে।'

এণাক্ষীও দাঁত দেখাল। স্বামীকে উদ্দেশ করে বললে, 'ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও না। বাইরের লোকের সামনে মিস্টার গুহ আড়ষ্ট বোধ করছেন।'

'করছেন?' জিগগেস করল শুভময়।

'না, না, সে কী কথা?' লাজুক ভঙ্গি করল কণাদঃ 'আড়ষ্ট হতে যাব কেন? তা ছাড়া ওঁকে তো চিনি। সেদিন আলাপ হল স্টিমারে—'

'বলুন আমাকে তাহলে বাইরের লোক বলা যায়?' কণাদকেই সালিশ মানল শুভময়।

'কিন্তু এ অকেশনে উনি তো ইনভাইটেড নন।' এণাক্ষী যন্ত্রণা আর পারল না লুকোতে।

এবার এণাক্ষীর কাছেই শুভময় পেশ করল। 'সংসারে কে ইনভাইটেড? আর এত যেখানে ভোগ্যবস্তু, যে যা পাচ্ছে সে তাই লুফে নিচ্ছে, কেড়ে খাচ্ছে।'

'প্যাটিস নিন।' রুচিরা শুভময়কেই সাধল। তারপর কণাদের দিকে ফিরেঃ 'আপনি?'

'না, আমি উঠি।'

কাজেকাজেই। জমল না এতটুকু। না গান না বাজনা না বা

একটু রঙ্গরস। গাড়ি কণাদও একটা জোগাড় করেছিল কিন্তু বৃথাই সেটাকে নিতে হল ফিরিয়ে।

রুচিরা শুভময়কে লক্ষ্য করে বললে, 'যদি চান তো মিস্টার গুহ লিফট দিতে পারেন আপনাকে।'

কোনো পক্ষ থেকে কোনো চাঞ্চল্য ফোটবার আগেই জগৎপতি গর্জন করে উঠলেন ঃ 'না।' পরে তাকালেন শুভময়ের দিকে ঃ 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

শুভময় থামল। কণাদ চলে গেল একা-একা।

ঘরে এক পিণ্ড ঠাণ্ডা লোহার মত স্তব্ধতা।

জগৎপতি দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। এক পা এগোলেন শুভময়ের দিকে। বললেন, 'শোনো। তুমি আর আমার বাড়িতে এস না।'

'আসব না ?'

'না, কখনো না। এলেও বাইরের বৈঠকখানা পর্যন্ত। অন্তঃপুরে নয়। অভিজাত পরিবারের ভেতরের লোকেদের সঙ্গে মিশতে তুমি উপযুক্ত নও।'

রুচিরা ভাবছিল এর পরে, আচ্ছা, আসি, বলে সোজা চলে যাবে শুভময়। তা নয়, সাফাই গাইবার চেষ্টা করল। 'আমার এইভাবে এসে পড়াটা খুব অন্যায় হয়েছে, তাই না ?'

'ঘোরতর অন্যায়।' জগৎপতি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিটা একটুকু শিথিল করলেন না। 'তোমার ব্যবহারে মিস্টার গুহ রীতিমত অপমানিত বোধ করেছেন। বুঝে নিয়েছেন কোন স্তরের জীবেদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা। রুচিরা কোন সমিতির সেক্রেটারি।'

'সে তো আগেই বুঝেছেন সেই স্টিমারে।'

'না, আজকে একটি বিশেষ বোঝাপড়ার জন্যে এসেছিলেন। এসেছিলেন রুচিরাকে পছন্দ করতে। কিন্তু তোমার অসৌজন্য তার অন্তরায় হয়েছে।'

'সে কী কথা ! আমি এখুনি ভদ্রলোককে ধরে আনছি।' শুভময় ভঙ্গিতে ছোটবার উদ্যোগ দেখাল : 'দেখি কেমন সে পছন্দ না করে ! যদি চান তো আদায় করে নিচ্ছি ডকুমেণ্ট।'

খিলখিল করে হেসে উঠল রুচিরা। যেন এক পক্ষের পছন্দেই হবে !

'না। তোমার কিছু করতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ দেখগে যাও।' জগৎপতি একেবারে চূড়ান্ত দাঁড়ি টানলেন।

শুভময় এণাক্ষীর দিকে এগোল। বললে, 'আপনার সেই ফুলগাছের কথা বলেছিলেন—' কী যে ফুলটার নাম নিজেই মনে করতে পারল না।

'না, দরকার নেই।' মুখের দিকে চেয়েও দেখল না এণাক্ষী।

'আর সেই হাতির দাঁতের জিনিস চেয়েছিলেন—'

'দরকার নেই। তুমি আর এস না।'

'আসবই না ?'

'না। তোমরা-আমরা দুই সমাজের লোক। তেলে-জলে মিশ খায় না কিছুতেই।'

চলে গেল শুভময়।

তারপর কিছুকাল জগৎপতি অনন্যস্মরণ হয়ে প্র্যাকটিসেই ডুবে রইলেন। তাঁর চটক ভাঙল যখন একদিন রুচিরা ধীর পায়ে কাছে এসে শান্তস্বরে বললে, 'আমি একটা মেয়ে-ইস্কুলে চাকরি পেয়েছি।'

'পেয়েছ—নাওনি তো এখনো ?'

'নিয়েছি। কাল জয়েনিং ডেট।'

'কত মাইনে ?'

'মাইনে সামান্য।'

'তোমার ঐ কটা টাকার মর্মান্তিক দরকার ?'

'দরকার টাকার নয়, দরকার স্বাধীনতার।'

'স্বাধীনতার ?'

'হ্যাঁ, তার চেয়ে বড় জিনিস কিছু হতে নেই সংসারে।'

'একটা গরিব মাস্টারি নেওয়াই যদি তোমার স্বাধীনতার নমুনা হয় তাহলে এ বাড়ি ছেড়ে তোমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে।'

'বা, তা কেন ?'

'তা নইলে ছোট কাজ করে আমার আভিজাত্যের সম্মান তুমি ক্ষুণ্ণ করতে পারো না।'

'মাইনে কম বলেই তো কাজটা ছোট ?'

'তা ছাড়া আর কী ?'

'কিন্তু কাজটা যদি বড় হত, মানে মাইনে যদি বেশি হত !'

'তা হলেও দেখতে হত কাজটা মানের কিনা, কাজটা কোথায়, কী ধরনের—'

'এইখানেই স্বাধীনতা।'

'নয় তো আমার বাড়িতে থাকবে আর আমারই সম্মান নস্যাৎ করবে এ হয় না, কোনোক্রমেই না। আমার বাড়ি ছাড়ো, ইচ্ছেমত স্বাধীনতা ফলাও, কিছু বলতে আসব না। দেখবও না তাকিয়ে। না, নেই, অমন অন্ধ স্নেহ নেই আমার।' শেষের কথাটায় যেন বেশি জোর দিয়ে ফেললেন জগৎপতি।

রুচিরা মনে-মনে হাসল। অমন বোকা আবেগও তার নেই যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় সে নিজের থেকে ছেড়ে দেবে, ছেড়ে দিয়ে অকূলে ভাসবে। বাবা যদি দেনও তাড়িয়ে ক'দিন বাদেই কোন না আবার ডেকে নেবেন বুকে তুলে।

এ সব ইতিহাসের চেয়েও পুরোনো।

চাকরিতে গেল না রুচিরা। এক চাকরি যায় আরেক চাকরি হবে।

'তুই সেদিন বড় চাকরির কথা বলছিলি না ?' জগৎপতি সেদিন বললেন, 'একটা জোগাড় করেছি তোর জন্যে।'

'মাইনে কত ?' উৎসাহ যেন এণাক্ষীরই বেশি।

'দেড় হাজার।'

'দেড় হাজার ! পনেরো শো ! একটা মেয়ের মাইনে পনেরো শো!'

'মেয়ের নয়, মেয়ের স্বামীর। অরিন্দমের। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, অরিন্দম রাজি আছে। কী বল ?' রুচিরার চোখে চোখ ফেললেন জগৎপতি : 'ওর বাবা যখন বেঁচে আছেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে সম্বন্ধটা উত্থাপন করি।'

জেরায় প্রশ্ন করে মনোমত উত্তর পাবারই আশা করায় অভ্যস্ত জগৎপতি। এক্ষেত্রেও আশা করেছিলেন রুচিরা বলবে, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। কিন্তু বেয়াড়া সাক্ষীর মত হঠাৎ বলে বসল, 'আমার সম্বন্ধ ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে মানে ? কাকে বিয়ে করবি ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কে সে ?'

'জিগগেস কোরো না। জানতে চেও না।'

'মানে ঐ স্কাউণ্ড্রেলটা ?'

রুচিরা চুপ করে রইল।

'কে, নাম বল,' কণ্ঠস্বর চাপতে চাইলেও পারছেন না : 'শুভময় ঘোষ ?'

'হ্যাঁ।' রুচিরা নিটোল গলায় বললে।

'ওটা তো বেজাত, জাতছাড়া।'

'মানে ঘোষ বলে ?' নম্র থাকবারই চেষ্টা করল রুচিরা : 'ও সব কায়েত-বামুন তো কোনোদিন মানতে না।'

'এখনো মানি না। ও সব নিয়ে কে মাথা ঘামায় ? কিন্তু ও ছাড়া আরো এক জাতিভেদ আছে।'

'সে আবার কী ?'

'বড়লোক আর ছোটলোক।'

'ছোটলোক? গরিব বলেই ছোটলোক?' যেন একটা ক্রুদ্ধ আর্তি রুচিরার বুক থেকে বেরিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, গরিব বলে।'

'তুমিও এককালে গরিব ছিলে বাবা।'

'যখন ছিলাম তখন ছিলাম। তখন তুই আদালতের একটা পিওনকে বিয়ে করতিস কিছু বলতে আসতাম না। কিন্তু এখন—' সাজানো ঘরের চারদিকে চোখ বুলোলেন জগৎপতি: 'এখন জাতে উঠে জাত খোয়াতে পারব না আমি কিছুতেই। না, কিছুতেই না। আমার মেয়ের বিয়েতে হাইকোর্টের জজেরা আসবে না এ অসম্ভব।'

অপমানে স্তব্ধ হয়ে রইল রুচিরা।

এণাক্ষী এতক্ষণে মুখ খুলল। এতক্ষণ এমন একখানা ভাব করে ছিল যেন একবর্ণও তার হৃদয়ঙ্গম হয়নি। কিন্তু এখন, ঘর হঠাৎ নীরব হয়ে যেতেই সমস্ত প্রাঞ্জল হয়ে উঠল নিমেষে। 'এ সব কী বলছিস তুই?' কণ্ঠস্বরে প্রায় মূর্ছা যাবার মত অবস্থা: 'ঐ গুণ্ডাটাকে বিয়ে করবি?'

রুচিরার মুখে কথা নেই।

'ঐ চাকরটাকে? যে সর্বক্ষণ লোকের ফাইফরমাস খাটে? বাজার করে? পানের দোকান থেকে পান কিনে আনে? বিড়ি খায়?' ঘৃণায় কিলবিল করতে লাগল এণাক্ষী।

আর যেন কিছুই বলবার নেই, কাটাকুটি করবার নেই, তেমনি বসে রইল রুচিরা।

'তোর রুচিকে বলিহারি! ওটা তোর চেয়েও কম লেখাপড়া জানে। আর মাইনে পায় কত? আমরা আমাদের ড্রাইভারটাকে যা দিই তার চেয়েও কম। ও তো একটা ভোলানটিয়ার।'

সূর্য পূব দিক ছাড়তে পারে আমি আমার প্রতিজ্ঞা ছাড়ব না। তেমনি যেন ভঙ্গি রুচিরার।

'এ বিয়ে যদি হয় তা হলে আমি বিষ খাব, গলায় দড়ি দেব, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব মাটিতে।'

জগৎপতি ও সব আতিশয্যে গেলেন না, বাস্তবকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ঃ 'ও তোর ভরণপোষণ করবে কী করে?'

রুচিরা চুপ।

'ও তো ওর কাকার বাসায় এক চিলতে এক ফালির মধ্যে থাকে, ও তোকে রাখবে কোথায়? আলাদা একটা বাসা ভাড়া নেবারও তো ওর সঙ্গতি নেই। কি, কী হবে ভবিষ্যতে? ভেবেছিস কিছু?'

রুগ্ন রেখায় হাসল একটু রুচিরা। বললে, 'ও সব এখনো কিছু চূড়ান্ত ভাবিনি।'

'ওগো সেই মিলিটারিটা সেদিন এই বুক-খোলা নচ্ছারটাকে গুলি করল না কেন? স্টেটবাস এত লোককে চাপা দেয়, ওকে কেন ছাড়া রেখেছে? পুলিশ এত রকবাজ গোলন্দাজকে ধরে, ওকে কেন এখনো ধরেনি? শোনো,' এণাক্ষী বিপুল বিক্রমে ঘোষণা করল ঃ 'যে করে পারো ঠেকাও এই বিয়ে। ভেঙে দাও, ভেস্তে দাও।'

সুতরাং ভাবতে দাও। মাথা গরম করে শুধু হৈ-চৈ করলে অপরপক্ষের জেদ বাড়ে। উৎপীড়ন করতে গেলে মরীয়া হয়ে ওঠে। চুপচাপ বসো পাশটিতে। বুদ্ধি দাও।

কিসের কী বুদ্ধি। সমানে চেঁচাচ্ছে এনাক্ষী ঃ 'অরিন্দমকে ডাকো। ওর হাতে যত শিগগির পারো দিয়ে দাও গছিয়ে।'

আর রুচিরা মনে-মনে স্থির করছে এ বিয়েকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতেই হবে। গরিব বলে যাতে আর প্রত্যাখ্যান চলবে না। চলবে না কোলাহল। শুভময় যাই হোক, যেমনতরোই হোক, তারই হাতে অনিবার্য হবে সমর্পণ।

শুভময় যে ফার্মে কাজ করে তার কর্তা অনাদি ঘোষালের সঙ্গে ষড় করলেন জগৎপতি। প্রাথমিক টাকাটা জগৎপতিই দাদন করলেন, অনাদি ভাব দেখাল কোম্পানিই খরচ দিচ্ছে। তবে যাও, দু বছরের ট্রেনিংএ চলে যাও বিলেত।

উত্তুঙ্গতম শৃঙ্গেরও বাইরে এই কল্পনা। কালো একটা আগুনের শিখার মত লেলিহান হয়ে উঠল শুভময়।

'টাকার জন্যে ভেবো না। আমিই তোমার গ্যারেণ্টার থাকব।' জগৎপতি ভরাট গলায় বললেন, 'কোম্পানি না দেয় টাকা আমি দেব। তুমি যাও, মানুষ হয়ে এস।'

উৎসাহে জ্বলতে লাগল শুভময়। পারলে এখুনি সে ছুট দেয়, পাল তোলে, পাখা মেলে আকাশে। বললে, 'আমার কত দিনের স্বপ্ন। একবার পৌঁছুতে পারলে আর কিছু ভাবি না। একবার ঝাঁপ দিতে পারলেই হল—ঝাঁপ দেওয়া নিয়ে কথা—ঝাঁপ দিতে পারলে পায়ের নিচে মাটি পাবই। হয় দাঁড়াবার নয় পড়বার। টাকা কত দিক থেকে আসবে, নয়তো ছিনিয়ে নেব গায়ের জোরে।'

পিঠ চাপড়ালেন জগৎপতি ঃ 'এত বড় একটা উচ্চাশা পরিপূর্ণতার অবকাশ পাবে না এ অসহ্য। তাই তোমার ফার্মকে ধরে এই সুযোগটা করে দিলাম।'

'আর ট্রেনিং কমপ্লিট করে এই ফার্মেই ফের ফিরে আসবে এই আমরা আশা করব।' বললেন অনাদি ঘোষাল। 'বণ্ড সই করে দেবে সেই মর্মে।'

'তা দেবে বইকি।' গম্ভীরমুখে বললেন জগৎপতি, 'তবে যদি নিজের কৃতিত্বে ওর চেয়েও ভালো চান্স কোথাও পাও, কোম্পানি তাতে বাদ সাধবে না।'

'নিশ্চয়ই নয়।' সায় দিল অনাদি ঃ 'শুধু ফার্মের টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলেই হবে।'

'তার জন্যে আমি আছি।' টেবলে কিল মারলেন জগৎপতি ঃ 'আর ইতিমধ্যে ফার্মের অবস্থা যদি খারাপ হয়, ফার্ম ব্যাক-আউট করে, তাহলেও ভাববার কিছু নেই।'

'আমি কিছুমাত্র ভাবি না, কোনো অবস্থাতেই না।' হাসতে লাগল শুভময়।

'তখনও আমিই আছি। সব সময়েই আছি। কোনো মামলা নিলে শেষ পর্যন্ত আমি না জিতে ছাড়ি না।'

কী ইঙ্গিত পেয়ে অনাদি চলে গেল ঘর ছেড়ে, শুভময়ের সঙ্গে জগৎপতি নিভৃত হলেন। অনাদিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ওর সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে, দেখবেন কেউ যেন না ঢোকে, দেয়ালে না কান পাতে।'

'ঠিক আছে।' ওপার থেকে বললে অনাদি। যেন নিজেই সে পাহারা দিচ্ছে এমনি আশ্বাস তার স্বরে।

'বোসো।' কণ্ঠে মধু ঢেলে বললেন জগৎপতি।

মুখোমুখি বসল শুভময়।

'তোমাকে মানুষ হবার এত বড় একটা চান্স দিচ্ছি কেন বুঝতে পারছ?' জগৎপতি শুভময়ের চোখের মধ্যে তাকালেন।

বুঝতে পারছে এমনি বিনয়কমনীয় ভঙ্গি করল শুভময়।

'যাতে তুমি রুচিরার যোগ্য হতে পারো। সমাজের উঁচু মহলে উঠে আসতে পারো সহজে।'

যেন বুকের উপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি খেল শুভময়। কিন্তু দিব্যি হজম করে নিল হাসি মুখে। বললে, 'তা তো ঠিকই।'

'কারু ওয়ারিশি পেয়ে বড় হওয়া সেটা কোনো কাজের কথা নয়।

'না, না, সব সময়ে নিজের জোরে বড় হওয়া।' অলক্ষ্যে হাত মুঠ করল শুভময়।

'প্রত্যেক ভালোবাসার মধ্যে শ্রদ্ধা বলে একটা জিনিস থাকে—কী বলো, থাকে কিনা?'

'নিশ্চয়ই থাকে।'

'থাকা উচিত। নইলে ভালোবাসা টেঁকসই হয় না। তারই জন্যে ধনে-মানে মজবুত হওয়া দরকার। তারই জন্যে তোমাকে বিলেত পাঠানো।'

এ সবও ছোটখাটো প্রহার, কিন্তু হাসিমুখে সব সহ্য করল শুভময়।

'তারপর, শোনো।' আরো একটু এগিয়ে এলেন জগৎপতি, কণ্ঠস্বরকে ঝাপসা করলেন: 'শুধু একটা সর্ত আছে, সর্তটা কঠিন।'

কঠিন বলে সংসারে কিছুই নেই এমনি উড়িয়ে দেবার হাসি হাসল শুভময়: 'বলুন।'

'তুমি যে যাচ্ছ এ কথা ঘূণাক্ষরে কাউকে বলতে পারবে না। যেন অন্তত রুচিরা না জানতে পারে।'

প্রথমটা শুভময় একটু বুঝি বা হকচকিয়ে গেল। শুকিয়ে গেল মুখ-চোখ। কথা বেরুল না।

জগৎপতি বললেন, 'রুচিরা যদি জানতে পারে তাহলে বিপদ আছে। বুঝতে পাচ্ছ?'

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছে শুভময়। নিজেরও অলক্ষ্যে ঠোঁট দিয়ে একবার জিভ চাটল। বললে, 'বুঝতে পাচ্ছি। জানতে পারলে ও বাধা দেবে।'

'হ্যাঁ, রব তুলবে, বিয়ে করে তবে যাও, কিংবা নিজেই যাবার জন্যে সঙ্গী হবার জন্যে হৈ-চৈ করবে। তার মানেই—বুঝতে পাচ্ছ—'

'তার মানেই যাওয়া বন্ধ।' ফাঁকা গলায় হাসির আওয়াজ তুলল শুভময়।

'মানুষ হবার বিরাট একটা সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ!' একটু বা দার্শনিক হলেন জগৎপতি: 'জীবনে বড় হতে হলে নিষ্ঠুরও হতে হয় মাঝে মাঝে।'

'বা, এ নিষ্ঠুরতা কোথায়?' জগৎপতির জীবনদর্শনে ভাষ্য জোগাল শুভময়: 'সব শুরুই শেষের জন্যে। আর যেখানে শেষ ভালো সেখানে সব ভালো।' একটু বুঝি বা জগৎপতিকেই সান্ত্বনা দিতে চাইল: 'তাছাড়া দু বছর কতটুকুই বা সময়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'হ্যাঁ, আড়ালে থেকে তোমারও রুচিরাকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার, তার ভালোবাসা খাঁটি কিনা, দু বছর তোমার জন্যে ঠিক সে প্রতীক্ষা করে থাকতে পারে কিনা, না, সবটাই তার মোহ, বড়লোকের মেয়ের খামখেয়াল।' জগৎপতি যেন শুভময়ের কত বড় বন্ধু, অভিজ্ঞ হিতৈষী, ডিফেন্সের উকিল—এমনি উদার ভাব করলেন।

'নিশ্চয়, পরীক্ষা দরকার।' সৎ হতে চাইল শুভময়। 'শুধু ওর নয়, আমারও। ওরও দেখা দরকার বড় হয়েও আমি কৃতজ্ঞ আছি কিনা, আবদ্ধ আছি কিনা চুক্তিতে।'

'সুতরাং ওকে কিছুতেই জানতে দেওয়া নয়।' চোখমুখ ঘোরালো করলেন জগৎপতি: 'যদি দেখি ও জানতে পেরেছে, তাহলে— তাহলে সমস্ত তক্ষুনি ভণ্ডুল করে দেব।'

'আমার কাছ থেকে কোনো ভয় নেই। কিন্তু অফিস থেকে যদি কথা ওঠে!'

'সাধ্যমত চেপে রাখবে অনাদি। তবু যদি কেউ ফিস ফিস করে সটান উড়িয়ে দেবে। অস্বীকার করবে। যদি রুচিরাও কিছু সন্দেহ করে, জিগগেস করে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শুভময় বললে, 'অস্বীকার করব।'

'শোনো, এ কটা দিন সমিতিতে বিশেষ যাওয়া-আসা করে কাজ নেই।'

'না, কী কাজ!'

'আর রুচিরার সঙ্গে দেখা করাও বন্ধ করে দাও।'

একটা বুঝি ঢোঁক গিলল শুভময়। বললে, 'একেবারে বন্ধ করে দিলে বরং সন্দেহ হতে পারে। তার চেয়ে যেমন দেখা হচ্ছে হোক, ওর মনটাকে সন্দেহের অতীত করে রাখি।'

'তা তুমি যা ভালো বোঝো।' উঠি-উঠি করলেন জগৎপতি: 'কিন্তু বলে দিচ্ছি, রুচিরার কথায় বা ব্যবহারে যদি বুঝি ও জানতে পেরেছে, তাহলে সমস্ত ক্যানসেল্ড।'

'আমি বোকা নই। নিজের কপাল আমি নিজে খাব না'। বুক-খোলা জামায় হাসল শুভময়।

'সমস্ত কিছু ভীষণ তাড়াতাড়ি করিয়ে নিচ্ছি। ধরো, আর সাত দিন। তারপর তুমি বম্বে চলে যাও। তোমার জাহাজ বম্বে থেকেই ছাড়বে। সেখানেই না হয় দিনকতক গাঢাকা দিয়ে থাকো।'

'তাই থাকব।' অলক্ষ্যে একটা নিশ্বাস ফেলল শুভময়: 'এদিকে না হয় চালু করে দেব অফিসের কাজে মফস্বলে গিয়েছি।'

কাঁটায়-কাঁটায় ঘুরল ঘড়ির কাঁটা।

হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেলে শুভময়কে সি-অফ করতে এলেন জগৎপতি। সঙ্গে অনাদি ঘোষাল। অনাদিকে শুধু নমস্কার করে জগৎপতিকে প্রণাম করল শুভময়।

'থাক থাক, এস।'

গাড়ি ছেড়ে দিল।

অনাদি বললে, 'তাড়িয়ে দিলেন, না, ওই পালিয়ে গেল ঠিক বোঝা গেল না।

কদিন পরেই বুঝবে। মনে মনে হাসলেন জগৎপতি, যখন টাকা গিয়ে আর পৌঁছুবে না। যখন পড়বে আথান্তরে। যখন জলে পড়ে হাত তুললেও কাউকে পাবে না আশেপাশে।

খুনের আসামী অনেক খালাস করেছেন জগৎপতি। কিন্তু খুন যে এত সহজ, এত আরামের, তা কোনোদিন জানতেন না।

৯

তারপর একদিন চাকায়-চাকায় ঘুরতে-ঘুরতে জগৎপতির মোটর উনিশ-এক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন জগৎপতি ঃ 'ভাস্কর আছ ?' দেখলেন তের-চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে মেঝেতে মাদুরে বসে পড়ছে। তার মনোযোগকে চটিয়ে দেবার জন্যে এবার চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ 'শোনো, এটা কি ভাস্কর বসুর বাড়ি ?'

ধড়মড় করে উঠল ছেলেটা। বাইরে গাড়ি দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। একটা গাড়িওলা লোক দাদাকে খুঁজছে এ একেবারে অভিনব।

'হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি।' সপ্রতিভের মত ছেলেটা বললে, 'দাদা বাজারে গিয়েছেন।'

'তারপরেই তো নাকে মুখে গুঁজে আপিসে বেরুবে। তবে আর সকালে দেখা করার সুবিধে হবে না। শোনো, ভাস্করকে বোলো সন্ধেয় আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'সন্ধেয় যে দাদার আবার টিউশানি আছে।'

'তাহোক। টিউশানির পরেই যেন যায়। আমি কে চেনো তো ?' গাড়ির দিকে অভ্যাসবশেই চোখ ফেললেন ঃ 'এ গাড়িটা কোন বাড়ির জানো তো ?'

'না।' নির্মল-সারল্যে ছেলেটা হেসে উঠল। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। বললে, 'গাড়ির নম্বরটা দেখে রাখছি। দাদা এলে বলব।'

'তোমার নাম কী ?'

'আমার নাম তো সোমনাথ।' তবু ভদ্রলোক নিজের নামটা বলে কিনা অপেক্ষা করতে লাগল।

জগৎপতি বললেন, 'বোলো মিস্টার চ্যাটার্জি এসেছিলেন। জরুরি কাজ আছে।'

আমাকে দেখামাত্রই চোখের পলকে সবাই চেনো এটাই তো যশস্বীদের আশা, কিন্তু এই ছেলেটা অপোগণ্ড বলে তত বিরক্ত হলেন না জগৎপতি। বাঙলায় জগৎপতি বলতেও কেমন যেন খেলো শোনায়, তাই মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন। যথেষ্টেরও বেশি পরিচয় দেওয়া হয়েছে এতে। বললেন, 'বোলো, ভুলো না।'

'ঐ যে দাদা এসে পড়েছেন।' বাঁচল সোমনাথ।

এক হাতে রেশনের থলে আরেক হাতে মাছের জায়গা—মাছের জায়গাটা খালি—দেখা দিল ভাস্কর।

'এ কি, আপনি ?' নমস্কার করার কথাও ভুলে গেল সহসা।

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।' ভাস্করের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলোলেন জগৎপতি। বললেন, 'সন্ধের পর টিউশানি সেরে যেও একবার আমার বাড়িতে। নয়তো যদি বলো তোমার এখানে—।' জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর চোখ ফেললেন আরেকবার।

'আমার এখানে কী ?' একটু আড়ষ্ট হল ভাস্কর : 'আমিই যাব আপনার বাড়ি।'

'হ্যাঁ, যেও। সুখবর আছে।'

গাড়িতে যেতে-যেতে মনে মনে হিসেব করলেন জগৎপতি। বাড়িতে চাকর নেই, ভাস্করই বাজার করে। মাছের দাম বেশি বলে মাছ কেনে না প্রত্যহ। ঘরের মধ্যে চেয়ার নেই, লোক এলে বাইরে দাঁড়িয়েই বোধ হয় কথা সারে। আর নেহাৎ ভিতরে নিতে হল বসতে মাদুর পেতে দেয়। মোট দুখানা ঘর মনে হল। পাশের ঘরে তক্তপোশ আছে কিনা বলা যায় না, তবে একজন মহিলার আভাস পাওয়া গেল, তিনি বোধ হয় মা। মা না থাকলেই বোধ হয় ভালো

ছিল। কিন্তু মা না থাকলে দুবেলা দুটো ফুটিয়ে দেবে কে? একটা রাঁধুনে বামুন রাখবার সঙ্গতি কই?

আরো খানিক দেখলেন তলিয়ে। ছেলেটা বোধহয় সৎ, স্থির, মজবুত। জামার বোতামগুলো বন্ধ, মাথার চুলগুলো পাখির বাসা করে রাখেনি। আরো মনে পড়ল সেদিন প্রথম তাঁর বাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যাবার সময়ও সে খোলা গেটটা খোলা রেখেই চলে যায়নি, যথারীতি বন্ধ করে দিয়েছিল। সে এলোমেলো নয়, সে ছন্দের অনুগামী। সে রীতির পূজারী। সে বিশ্বাসযোগ্য।

সুখবর বলতে আর কী, কোথাও একটা চাকরির সুবিধে হয়েছে হয়তো।

এতটা যেন আশার বাইরে, এমনি করেই দেখলেন মহালয়া। বললেন, 'হয়তো বা কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত বাবাকে উদ্ধার করার ডাক পড়েছে।'

'তাতে আমার কী!' তেতে উঠল ভাস্কর: 'সেটা আমার কী সুখবর!'

'বা, আমার সুখবর। আমার ঘরদোর আলো হয়ে উঠবে!'

'সেই ঘরের আলোতে তুমি বাইরে বসে আঁধার দেখবে। যা না রোজগার তাতে আবার বিয়ে!'

টিউশনি সেরে সন্ধ্যার পরে ঠিক হাজির হল ভাস্কর। দেখে মনে হল অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছেন জগৎপতি।

বৈঠকখানায় না বসিয়ে পাশের ছোট একটা ঘরে নিয়ে এলেন। আস্তে বললেন, 'বোসো।' বসতেই একেবারে খিল চাপালেন দরজায়।

মাঝখানে একটা চেয়ার রেখে দুজনে বসলেন মুখোমুখি। আজে-বাজে মামুলি কথা পাড়লেন প্রথমে, আজকের খবরের কাগজের কথা, দেশের দুর্দশার কথা, প্রতিষ্ঠান বা পার্টি দিয়ে কী হবে যদি মানুষ না

থাকে, আর মানুষেই যদি বিশ্বাস না রাখা যায় তা হলে পৃথিবীতে কী নিয়ে থাকবে মানুষ, এমনি সব অবান্তর কথা।

একটু বুঝি বা চঞ্চল হল ভাস্কর। হাসি-হাসি মুখ করে বললে, 'কী একটা সুখবর আছে বলছিলেন—'

'বলছি।' এত বড় একটা কোর্টকাঁপানো উকিল, কথার ভট্টাচার্য, তারই মুখ দিয়ে কিনা এখন কথা বেরুচ্ছে না। 'আচ্ছা তোমার সেই চাকরিটা হয়নি যেটার জন্যে আমার কাছে সেই এসেছিলে ?'

'কী করে হবে ? আপনি বিমুখ হয়ে রইলেন।'

'হ্যাঁ, সেটা আমার পক্ষে উচিত হয়নি। আমার এত মানুষ নিয়ে কারবার, আমার লোক চেনা উচিত ছিল। তুমি সেই যে বলেছিলে আমার মুখ দেখুন সেইটেই খাঁটি কথা। আমি মনে-মনে ঠিক চিনেছিলাম তোমার মুখ দেখে, কিন্তু জানো, ওকালতির ঐ এক বিষম দোষ—একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলে প্রাণপণে তাকেই আঁকড়ে থাকা, আর তাকে ছেড়ে দেওয়া নয় কিছুতেই। কত অমন ক্ষুদ্র তুচ্ছ পয়েন্টের ফাঁক দিয়ে বড়-বড় মামলা ফেঁসে গেছে, সেদিন তোমারটাও গেল। কিন্তু জানো, সেই দিন থেকে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। তোমার একটা ক্ষতি পূরণ না করে দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিনে। আচ্ছা, যেখানে এখন তুমি আছ সেখানে কত পাচ্ছ ?'

'সব সুদ্ধ একশো চৌষট্টি টাকা।'

'মোটে ? আচ্ছা, তোমার মাইনে যদি সাড়ে তিনশো হয়, চারশো হয় ?'

এতে আবার কী হয় জিগগেস করতে হয় নাকি ? ভাস্কর নির্লিপ্তের মত শূন্যে তাকিয়ে রইল।

'ভালোই হয়, কী বলো ?'

এর আবার ভাস্কর কী বলবে ? ভাস্কর কি কোনোদিন অত মাইনে কারু হতে দেখেছে সজ্ঞানে ?

'তোমরা তো দুটি ভাই। আর—' থামলেন জগৎপতি।

'আর, মা আছেন।'

হালকা হয়ে যাবার মত নিশ্বাস ফেললেন জগৎপতি। 'আর কোনো ডিপেণ্ডেণ্ট ?'

'আপাতত নেই।'

'তা হলে ওরকম একটা মোটাসোটা মাইনে হলে বিয়েও করতে পারো স্বচ্ছন্দে।'

কাষ্ঠের মত হাসল ভাস্কর ঃ 'বর্তমানে যা মাইনে তাইতেই তো মা অস্থির হয়ে উঠেছেন।'

'না, বর্তমান মাইনেতে হয় না। শোনো,' একটা প্যাকেট থেকে কিছু কাগজ বের করলেন জগৎপতি ঃ 'এই য়্যাপলিকেশন ফর্মটা ফিল-আপ করে কালই পাঠিয়ে দাও। এ কোম্পানির মালিক, বদ্রীবিশাল আমার মক্কেল। আমার খাতিরেই একটা ওপনিং করে দিচ্ছে তোমার জন্যে। ইনস্পেক্টরের চাকরি, চাকরিটা ভালো। মাইনে ভালো হলেই সমস্ত ভালো। কত টিনের ঘরের টালির ঘরের কোর্টে গিয়ে কেস করেছি ; ফি দিক না, গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেস করব। যজ্ঞে ঘি ফেল, যেখানেই হোক জ্বলবে দাউ দাউ করে।'

'চাকরিটা পার্মানেণ্ট ?'

'নিশ্চয়ই। নইলে তুমি তা নেবে কেন ? তুমি একবার গিয়ে সব দেখেশুনে এস না। পছন্দ না হয় চলে আসবে।'

'না, না, নামকরা ফার্ম,' ফর্মটা উলটে-পালটে দেখল ভাস্কর ঃ 'দেখবার শোনবার কিছু নেই।'

'দেখবে য়্যাপ্লাই করার সঙ্গে-সঙ্গেই চাকরি। ইণ্টারভিয়ুও লাগবে না।'

'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ?' ভাস্কর না বলে পারল না।

'না, তাও না। শুধু ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে শার্ট-প্যাণ্ট পরতে

হবে। জুতো কাবলি পর্যন্ত চলতে পারে কিন্তু স্যাণ্ডেল চলবে না। তার মানে ঢিলেমি ছেড়ে স্মার্টনেসে আসতে হবে।'

'বা, তাতে আপত্তি কী! যেমন কাজের যেমন পোশাক। যে আফিসের যা রেওয়াজ তা মানতে হবে বৈকি।'

'পোশাক-আশাকের জন্যে তোমার হাতে টাকা না থাকে, আমি দিতে পারি চালিয়ে।'

'না, না, তার জন্যে ভাবতে হবে না আপনাকে। সে আর কটা টাকা।'

তবু সমস্তই যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, অবাস্তর মনে হচ্ছে ভাস্করের কাছে। যেন আরো কিছু কথা আছে, অন্য কিছু বক্তব্য। এতেই যেন রহস্যের শেষ নয়।

তবু কই, মুখ খুলছেন না তো জগৎপতি।

তবে এবার উঠতে হয়। দরখাস্তের ফর্মটা ভাঁজ করে পকেটে পুরেছে ভাস্কর, জগৎপতি হঠাৎ গলা নামালেন: 'আর শোনো, তোমাকে আমি দশ হাজার টাকা দেব।'

'টাকা? দশ হাজার! আমাকে!' ভাস্কর কি মাটিতে আছে না শূন্যে আছে বুঝতে পাচ্ছে না।

'হ্যাঁ, বিয়ের যৌতুকস্বরূপ দেব। প্রথমে পাঁচ হাজার, পরে আরো পাঁচ। কিংবা যদি বলো—'

ভাস্কর কী বলবে! সে তো জড়, পাথর হয়ে গিয়েছে। বললে, 'কে বিয়ে করবে?'

'তুমি।'

'আমি বিয়ে করব, তায় আপনি যৌতুক দেবেন কেন?'

'বা, আমার মেয়েকেই যে বিয়ে করবে। মেয়ের বিয়েতে জামাইকে শ্বশুর যৌতুক দেয় না?' কথার সুরে জগৎপতি যেন একটু স্নেহ মেশালেন।

যেন কোন এক রূপকথার রাজ্যে উড়ে এসেছে, ভাস্কর তেমনি ঘুমেজড়ানো গলায় জিগগেস করল, 'আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব? তার মানে আমার হাতে আপনার মেয়েকে সঁপে দেবেন, তুলে দেবেন? এও হয় নাকি? এ আপনি কী বলছেন?'

'ঠিকই বলছি।'

'আমি কি আপনার মেয়ের যোগ্য? আমি একটা সামান্য মাইনের কেরানি—

'চারশো টাকা মাইনের ইনস্পেক্টর—জামাই হিসেবে একেবারে মন্দ কী!' জগৎপতি একটু হাসবার চেষ্টা করলেন: 'তা ছাড়া যোগ্যতা তো শুধু টাকার নয়, যোগ্যতা চরিত্রে, যোগ্যতা সাধুতায়। যোগ্যতা মনুষ্যত্বে।'

'এ সব কী প্রলাপ বকছেন?' ভাস্কর ছটফট করে উঠল: 'আপনার মেয়ে জানেন? তাঁর এ বিয়েতে মত আছে?'

'রুচিরার মত না থাকলে তোমাকে বলতে সাহস পেতাম কী করে? সে রাজি আছে বলেই তো—'

'কিন্তু কেন? আমি কেন? আমি কে?' ভাস্কর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: 'রূপে-গুণে উজ্জ্বলন্ত মেয়ে, কোথায় রাজার ঘর আলো করবে, তার জন্যে কিনা আমারই ভাঙা বাড়ি ঠিক করলেন? আমি কোথাকার কে এক হরিপদ কেরানি—'

হঠাৎ ঘরের আলো অফ হয়ে গেল, সমস্ত কিছু মুছে গেল, ডুবে গেল অন্ধকারে।

বেশিক্ষণ নয়।

কতক্ষণ পরেই আবার আলো জ্বলল। ঘরে আলো হতেই শোনা গেল জগৎপতিকে: 'কিন্তু তুমি মহৎ। তুমি বিশ্বাসযোগ্য। তবে এই সর্ত, তুমি এক বছর বাদে বিয়ে আবার নাকচ করে দেবে। ডিভোর্স দিয়ে দেবে রুচিরাকে।'

এতক্ষণে যেন পায়ের তলায় মাটি পেল ভাস্কর। 'তাই বলুন। এক বছর পর বিয়ে আবার ভেঙে দিতে হবে!'

'এক বছর না হোক বড় জোর দেড় বছর।' জগৎপতি মনে মনে হিসেব করলেন।

'মানে বিয়ে করে আবার তা ভেঙে দিতে হবে।' মূঢ়ের মত হাসল ভাস্কর: 'তাও আবার হয় নাকি?'

'খুব হয়। কিছুমাত্র হাঙ্গামা নেই। তোমাকে শুধু তিনবার তিনটি দস্তখৎ করতে হবে। ব্যাস, তা হলেই নিষ্পত্তি।'

'শুধু তিনবার?' যন্ত্রের গলায় আবৃত্তি করল ভাস্কর।

'প্রথমে বিয়ের নোটিশে একটা সই, দ্বিতীয় সইটা বিয়ের দলিলে, আর তৃতীয়টা ডিভোর্সের আর্জিতে। কিছুমাত্র হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না তোমাকে।' আশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকালেন জগৎপতি। যেন কোথাও এতটুকু বালি-কাঁকর নেই, আগাগোড়া মোলায়েম।

'কিন্তু—' আবার কোথায় যেন একটা দুষ্টু কাঁটা খোঁচা মারছে। ঢোঁক গিললে ভাস্কর।

'বলো, হ্যাঁ, যা কিছু প্রশ্ন আছে খোলসা করে নেওয়াই ভালো।'

'আর কিছু নয়', ভাস্কর হাসল: 'বিয়ে নাকচ করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটাও নাকচ হয়ে যাবে?'

'না, তা কেন?' জগৎপতি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'চাকরির সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কী? বিয়ে ছুটে গেলেও তোমার পার্মানেণ্ট চাকরি পার্মানেণ্টই থাকবে। অত কথায় কাজ কী? আগে চাকরিতে ঢুকবে পরে তো বিয়ে। সুতরাং চাকরি নেবার পর যদি বিয়েটা না-ও করো—'

'না, না, চাকরির সর্তই তো বিয়ে।' ভাস্কর গম্ভীরমুখে বললে, 'আর কথা একবার দিলে তা রাখতে হবে বৈকি।'

'এইটেই তো কথার মতো কথা।' জগৎপতি আবার আশ্বাসের

আলো আনলেন চোখেঃ 'আর আমি বলছি এতে তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

'না, না, ভয়ের কী!' খোলা গলায় হেসে উঠল ভাস্কর।

'লোকসানও কিছু নেই।'

'লোকসান!' ভাস্করের চোখে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেলঃ 'লোকসানের কথা কে ভাবে?'

'তবে—'

তবু কী যেন ভাবনা থেকে যায় এখানে-ওখানে। ভাস্কর চেয়ার থেকে উঠি-উঠি করতে-করতে বললে, 'দু-চার দিন একটু ভেবে দেখি।'

'কিন্তু তাই বলে চাকরির দরখাস্তটা দিতে কিন্তু দু-চারদিন দেরি কোরো না। কালকেই পাঠিয়ে দিও। নিজের হাতে যদি দিয়ে আসতে পারো তাহলে সব চেয়ে ভালো হয়।'

সত্যিই তো, আসনে আবার স্থির হল ভাস্কর। কালকেই তো চাকরিটা ধরতে হয়—অন্তত দেখে-শুনে আসতে হয়—যত শিগগির অবহিত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। আর চাকরি সম্বন্ধেই যদি সে কৃত-সঙ্কল্প হয় তা হলে অন্য বিষয়টা সম্বন্ধে দ্বিধা করার অবকাশ কোথায়?

ভাস্কর ফের শিথিল হয়ে বসেছে লক্ষ্য করলেন জগৎপতি। বললেন, 'এতে ভাববার কী আছে? তোমার কোথাও এতটুকু ক্ষতি নেই, বিপদ নেই। ঝামেলা নেই এক ফোঁটা। একবার নামটা লেখা, আরেকবার নামটা কেটে দেওয়া। ব্যস, ফুরিয়ে গেল। কেউ কিছু জানতেও পারবে না।'

'জানতেও পারবে না?' চমকে উঠল ভাস্কর।

'না, মানে, বিয়েটা জানতে পারবে, ডিভোর্সটাও জানতে পারবে। সে সব আমিই ব্যবস্থা করব। তা ছাড়া এ তো হয়, হামেশাই হচ্ছে আজকাল। কি, হয় না?'

'হয় বৈকি। সংসারে কী না হয়? এমন সব হয় যা ভাবাও যায় না।' ভাস্কর নিশ্বাস ফেলল।

'এ তো প্রায় ডাল-ভাত। বড় ঘরের মেয়ে একটা হেঁজিপেঁজির সঙ্গে প্রেমে পড়েছে এ শোননি তুমি কোনো দিন?'

'কিন্তু এটা কি প্রেম?'

'তাই রাষ্ট্র করতে হবে। আর প্রেমের বিয়ে বছর ঘুরতেই ভেঙে যাচ্ছে এও এমন কিছু আশ্চর্য নয়। লোকে সর্তের কথা কী করে জানবে? সে তো আর লেখাপড়া হচ্ছে না। সে আমাতে-তোমাতে। লোকে জানবে বিয়ের পর বনিবনা হয়নি, বড়লোক-গরিবের বিয়েতে এ রকম অমিল হয়েই থাকে—তাই ডিভোর্স হচ্ছে। এতে অত ঘাবড়াবার আছে কী! লোকের এ ক্ষেত্রে অন্য অনুমানের অধিকার নেই। আইনই দেবে না সে অধিকার।' জগৎপতি টেবলের ধারটা ধরলেন মুঠ করে।

'আইন?'

'হ্যাঁ, আইন। যখন তোমার বিয়ে, তোমার স্ত্রী, তোমারই সমস্ত।'

'আবার সেই সমস্ত দিয়ে দিতে হবে জলাঞ্জলি।' ম্লান মুখে হাসল ভাস্কর।

'তা দিলেই বা। যা আসলে তোমার প্রাপ্য নয়, ন্যায্য নয়, তা তুমি রাখবে কেন?' জগৎপতি বিস্ময়ের ভাব করলেন: 'তা তুমি বিদেয় করে দেবে। তুমি যেটুকু করবে সবই পরিত্রাতার ভূমিকায়। তার জন্যে তোমার টাকা, চাকরি—'

'টাকা?' কথাটা যেন ভুলে গিয়েছিল ভাস্কর, প্রায় উছলে উঠল।

'হ্যাঁ, বলেছি তো, নগদ দশ হাজার—বিয়েতে পাঁচ, বিচ্ছেদে পাঁচ। আর স্থায়ী শাঁসালো চাকরি। এ প্রায় রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া জমিদারি—এ কি কেউ ছাড়ে?'

কিন্তু সেই সঙ্গে তার বদলে, আরো কত বড় জিনিস ছেড়ে দিতে হবে তার কে হিসেব রাখে?

'কেউ ছাড়ে না। এত বড় একটা সুযোগ আসে না হামেসা। আচ্ছা,' চেয়ার ছেড়ে উঠল ভাস্কর: 'মানে পরোপকারের সুযোগ।'

'তবে তোমার ফাইন্যাল কথাটা জানতে পারব কবে? কাল? নতুন চাকরিতে জয়েন করবার পর?'

'আমার মাকে জানাই। তিনি কী বলেন—'

'না, না, মাকে জানানোর দরকার নেই।' শত মুখে 'না' করে উঠলেন জগৎপতি: 'তাঁকে জানিয়ে লাভ কী? তিনি যদি মত না দেন?'

সত্যিই তো, কিছুই হয় না তা হলে। চাকরিটাও হয় না।

'সব ছেলেই মাকে জানিয়ে প্রেম করে নাকি? না কি বিয়ে করে? একেবারে বউ নিয়ে গিয়ে মাকে প্রণাম করে। রাখো,' প্রায় ধমকে উঠলেন জগৎপতি: 'মাতৃ-ভক্তি দেখাতে হবে না। তোমার মাকে যা বলবার আমি বলব।'

'বা, তা হলে তো কথাই নেই।' দরজার দিকে এগুলো ভাস্কর।

'তা হলে নতুন অফিসটা যাচাই করে কালকেই আমাকে ফাইন্যাল কথা দিচ্ছ।'

'দেখি—'

'বেশ, কাল না হলে পরশু।' দৃঢ় হলেন জগৎপতি।

'পরশু।'

ভিতরে-বাইরে আকুল চোখে তাকাল ভাস্কর। যার জন্যে এত সে কই? তাকে কি একবার দেখা যায় না স্বচক্ষে? বিয়ে হবে কি কনেকে দেখতে না দিয়ে? অন্ধকারে রেখে?

সেই কবে একবার দেখেছিল ঐ বৈঠকখানায়। যেন একটা বিদ্যুৎ আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে কি কারণে শূন্যে মিলিয়ে যেতে

পারেনি, খাড়া হয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরো দু একবার দেখেছে হয়তো রাস্তায়, মোটরে। রাস্তা দিয়ে কে হাঁটছে ফিরেও তাকায়নি। আজ, এখন, একবার দেখা হয় না? দেখতাম চোখ দুটো কতটা উদাসীন। আর বিদ্যুৎ জুড়ে কটা মেঘের পলস্তারা।

ভাস্করের ঔৎসুক্যকে ধরতে পেরেছেন জগৎপতি। বললেন, 'রুচিরার শরীরটা ভালো নেই।'

'না, না, তাকে বিরক্ত করে লাভ কী। সবই তো কাগজকলমের ব্যাপার।' হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল ভাস্কর। 'দলিলের লীলাখেলা।'

'কাল তবু একবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো। হ্যাঁ, আর, যা বললাম তা যেন আর কাউকে প্রকাশ কোরো না।'

'আমি কি পাগল? নিজের পায়ে কুড়ুল মারি? জানাজানি করে ফাঁসিয়ে দিই মামলাটা?' ভাস্কর একটু বা মিনতি ঝরাল কণ্ঠে: 'আপনিই যেন আর কাউকে বলবেন না।'

বাড়িতে ফিরলে মহালয়া জিগগেস করলেন ব্যাপারটা কী।

'একটা চাকরি দিতে চায়।'

'সে কী?' চমকে উঠলেন মহালয়া: 'কত মাইনে?'

'সাড়ে তিন শো চারশো—' যেন গায়ে লাগে না এমনি ভাবে ভাস্কর বললে।

'কী সর্বনাশ! এত?' মহালয়া চোখ প্রায় কপালে তুললেন: 'হঠাৎ তোর প্রতি এত দয়া।

দিব্যি গোপন করল ভাস্কর। বললে, 'একবার আমার চাকরিতে সার্টিফিকেট দেয়নি চাওয়া সত্ত্বেও, তাই হয়নি সেই চাকরিটা। তারই প্রায়শ্চিত্ত করল বোধ হয়।'

'লোকটা ভালো।' রায় দিলেন মহালয়া।'

'ভীষণ ভালো।' সায় দিল ভাস্কর: 'প্রথম-প্রথম ঠিক বোঝা যায় না।

হোক অসুস্থ, তবু রুচিরার সঙ্গে কথা না বলে কিছুই করা যাবে না।

'চাকরি কেমন দেখলে?' জিগগেস করলেন জগৎপতি।

'সব ঠিক হয়ে ছিল। দরখাস্তটা দিতেই য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়ে দিয়েছে।'

'তাই দেবে। তেমনি বলা ছিল। স্টার্টিং কত দিল?'

'সাড়ে তিন শো।'

'তাই বা ক'জনে দেয়। তিন মাস পরেই চারশো দেবে দেখো।' জগৎপতি একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলেন: 'তোমার মাকে বলেছ?'

'বলেছি।'

'কী বললেন?'

'বললেন, এবার আর কোনো কথা শুনব না, বিয়ে করে বউ এনে দিতেই হবে আমাকে।'

'তাই বলো!' সশব্দে হেসে উঠলেন জগৎপতি। 'কবে জয়েন করছ?'

'করছি শিগগিরই। কিন্তু—'

'কিন্তু কী, বলো।'

'মিস চ্যাটার্জির সঙ্গে নিভৃতে একবার দেখা করা দরকার।' ভাস্কর চোখে-মুখে সারল্য আনবার চেষ্টা করল: 'আপনি বলুন, আমার অবস্থায় পড়লে আপনি একবার না দেখা করে পারতেন? হ্যাঁ কি না তাঁর মুখের কথাটা একবার শুনে নিতেন না স্বকর্ণে? মন খোলসা করে নিতেন না?'

কথাটা আর বিশ্লেষণ করবার কী আছে? আর এর মধ্যে

মনেরই বা প্রবেশ কতটুকু যে তাকে পরিষ্কার করে নিতে হবে ? এ তো শুধু কটা দস্তখতের কারিকুরি। তবু পুরুষের কৌতূহল কী বস্তু তা জগৎপতি বোঝেন। সুতরাং ভাস্করের প্রস্তাবে অসঙ্গত কিছু নেই। তবু উকিলিবিদ্যায় পারঙ্গম, একটু অন্যরকম করে না বলে পারেন না থাকতে। তাই বললেন, 'এ তো নেগোশিয়েটেড ম্যারেজ। এ রকম ক্ষেত্রে বর-কনের প্রথম দেখা তো বিবাহ-সভাতেই হয়ে থাকে। আগে আর হয় কবে ?'

'এখানে বিবাহ-সভাটা কোথায় ?'

'রেজেস্ট্রি-অফিসে।'

'বিয়ে যখন রেজিস্টারি করে তখন এটাই ধরে নিতে হবে বিয়ের আগে থেকেই পার্টিদের জানাশোনা।' লঘু সুরটাই বজায় রাখল ভাস্কর: 'নইলে আকস্মিভাবে দুজনে একদিন বিয়ে-আফিসে এসে পড়েই বলা নেই কওয়া নেই দলিলে দস্তখত করে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী সাজল এটা বোধহয় নাটকেও চলে না।'

'তা অন্যায় বলোনি।' তর্ক আর বাড়ালেন না জগৎপতি। সন্দেহ কি, তুরুপের তাস ভাস্করের হাতে। এখন এক ধাব থেকে সব পিট নেবারই মালিক সে নিঃসন্দেহ। তাই আর কাঁটা-খোঁচা না রেখে বললেন সহজ সুরে: 'তাহলে তুমি একটু বোসো, আমি ওকে খবর দিই।'

'খবর দেবেন মানে—' ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করতে চাইল ভাস্কর।

'মানে, দেখে আসি ও এখনই দেখা করতে প্রস্তুত কিনা, না, কি দেখা করার অন্য সময় ঠিক করে দেবে।'

মুহূর্তে মাথার মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ভাস্কর মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সেই সঙ্গে স্থানটাও ঠিক করে নেবেন।'

'স্থান ? স্থান আবার কোথায়। স্থান তো এখানেই, এ বাড়িতেই।'

'না। আমার মনে হয়, দেখাটা আমার বাড়িতেই হওয়া দরকার।'

'তোমার বাড়িতে ?' যেন জগৎপতির পিঠে কে ছোরা বসাল।

'সেইটেই তো সমীচীন। যেহেতু এক্ষেত্রে প্রার্থী আমি নই, প্রার্থী উনি।' একটু বা রুক্ষ শোনাল ভাস্করকে ঃ 'যে প্রার্থী সেই যায়, সেই সাধে। আর যে দেয়, যে প্রার্থনা পূরণ করে, সে নড়ে না, সে তার নিজের জায়গায় বসে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে মিস চ্যাটার্জিই যাবেন আমার কাছে, আমার বাড়িতে, তাঁর আবেদন নিয়ে। সেই-টেই শোভন, সেইটেই সম্ভ্রান্ত। বলুন, ঠিক বলছি না ? আর্জি নিয়ে দরখাস্ত নিয়ে প্রার্থীই কোর্টে যায়, কোর্ট কি আর প্রার্থীর বাড়িতে আসে ?'

'তা কমিশনে জবানবন্দি নিতে কোর্টও বাড়িতে আসে বৈকি।' গভীরে একটু বুঝি বিরক্ত হলেন জগৎপতি। 'তাছাড়া তোমার বাড়িতে জায়গা কোথায় ?'

'তা যা জায়গা আছে তাই যথেষ্ট। একটা কথা সারতে আর কত জায়গা লাগে ?'

'না, না, আমি বলছি একটু কম্ফর্টেবলি বসে অন্য দু-চার কথার মধ্যে বিষয়টা পাড়লেই ভালো হয়।'

অভিমানের ছোঁয়াচ এখনো বুঝি সম্পূর্ণ কাটল না স্বর থেকে। ভাস্কর বললে, 'সোফা-কৌচ না থাকলেও কম্ফর্টেবলি বসা যায় হয়তো। তা ছাড়া, বিস্তৃত আলাপ করবার অবকাশ এখন কোথায়, প্রয়োজনই বা কী। যে ঘটনটা ঘটতে চলেছে তাতে ওঁর সম্মতিটা কতদূর তাই একটু যাচাই করে নেওয়া। আমি জানি আপনি ওঁর ঠিকই প্রতিনিধিত্ব করছেন তবু ওঁর সঙ্গে যে একটা সাক্ষাৎ বোঝাপড়া দরকার তা অস্বীকার করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে কথাটা নিশ্চয়ই খুব সংক্ষিপ্ত হবে, দ্রুত হবে—'

চাকরিটা বাগিয়ে নিয়ে সরে পড়তে চায় নাকি ? কিন্তু, না, তা কী করে হয় ? মুখ-চোখের তেমন চেহারা নয়, আর, তা ছাড়া,

স্বরে যুক্তি নেই এমন কথাও বলা যায় না। জগৎপতি স্বর বদলালেন। 'এখুনি যদি ও যায়, তোমার মা যে দেখে ফেলবেন। কী ভাববেন তিনি? কী বোঝাবে তাঁকে?'

ভাস্কর এক মুহূর্তও দেরি করল না ভেবে নিতে। বললে, সময় আগে থেকে ঠিক করা থাকলে সে সময় মাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেব।'

'কিন্তু', গলা নামালেন জগৎপতি: 'প্রতিবেশীরা তো আছে। তোমাদের পাশেই তো আরেক ভাড়াটে। কে কী দেখে নিয়ে কী সন্দেহ করবে, স্বরু করবে ফিসফিসানি, বলা যায় না। ব্যাপারটা যত গোপনে রাখা যায়, যত চুপচাপ—'

'তবু, তাই বলে—' ভাস্কর আবার কী আপত্তি তুলতে চাইল। একটা ভিক্ষুক-ভিক্ষুক ভাব করে সে যাবে নিচু হয়ে এই ভঙ্গিটা সে কিছুতেই তার মর্জির সঙ্গে পাচ্ছে না খাপ খাওয়াতে।

জগৎপতি আর দেরি করলেন না। তর্কে না থেকে সরাসরি মিনতিতে নেমে এলেন। বললেন, 'ওর অবস্থাটা তো তুমি সহজেই বুঝতে পারো। দেহে-মনে একেবারে ভেঙে গিয়েছে। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা কেউ পারে ক্ষমা করতে? সর্বক্ষণ দু হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে।'

শুধু এইটুকুতেই হল না, হবে না—বুঝে নিলেন জগৎপতি। বললেন: 'খালি কাঁদছে, চুল ছিঁড়ছে, দেয়ালে মাথা কুটছে। স্নান করছে না, খাচ্ছে না, ঘুমুতে পাচ্ছে না। শেষকালে মরে যাবে মেয়েটা? শুধু ক্ষণিক একটা ভুলের জন্যে, এত বড় একটা জীবন ছারখার হয়ে যাবে? বলো আমি তাই হতে দেব? আমার যে আর কেউ নেই—' ভাস্করের কাঁধে হাত রাখলেন জগৎপতি।

'বা, আমি তো প্রায় রাজিই।'

'আমি তা জানি। তুমি দয়ালু, তুমি মহানুভব, তুমিই প্রগতিপন্থী। এই দয়াতেই তোমাকে আরো একটু উদার হতে হবে। মেয়েটা যে

সত্যিই অসুস্থ, অক্ষম। অন্তত সেই কারণেই যদি একটু ক্ষমা করো—'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইল ভাস্কর। বললে, 'বেশ, এ খানেই দেখা করব। তবে সময়টা কখন হবে—'

আর জট পাকালেন না জগৎপতি। বললেন, 'সময় আর কী। এখুনি, এখুনিই তো হতে পারে। সবই যখন ঠিক, তখন দেরি করার মানে হয় না। তুমি এস, চলে এস আমার সঙ্গে উপরে। এখুনি আলাপ করিয়ে দি।'

সিঁড়িতে পা ফেলে-ফেলে উঠতে লাগলেন জগৎপতি।

আশ্চর্য ভাস্করও চলতে লাগল পিছু-পিছু।

এটা কী রকম হচ্ছে কে জানে। ভাগ্যের মুখ হিংস্র না গম্ভীর না পরিহাসতরল তাই বা কে বলবে। নিজের বেশবাস, ক্লান্তি-গ্লানির কথাও একবার চেষ্টা করল ভাবতে, ভাববার কিছু প্রয়োজন আছে কিনা তাও ভেবে পেল না। ও-পক্ষেও কোনো উদ্যোগ নেই আয়োজন নেই। সজ্জা-চেষ্টা তো দূরের কথা। তবু দু-জনের দেখা হবে। আর, এই কিনা প্রথম দেখা।

'চলে এস।' উপরে ঘরে যে আছে তাকে অবহিত করবার উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লেন জগৎপতি: 'রুচি ঘরেই আছে। কোথায় আর যাবে এ সময়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলে এস।'

কোথায় চলেছে ভাস্কর? কাকে দেখতে! কাকে পেতে, কাকেই বা আবার ছেড়ে দিতে!

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন জগৎপতি।

'এই যে তুই আছিস। সেই যে বলছিলাম—সেই ভাস্কর, ভাস্কর বোস এসেছে।' পর্দার বাইরে অপেক্ষা করছিল ভাস্কর, তাকে লক্ষ্য করে জগৎপতি বলে উঠলেন, 'এস, এ ঘরে এস। তোমাদের কথাটা সেরে নাও। ক্লিয়ার করে নাও। হ্যাঁ, সব কিছু ক্লিয়ার করে নেওয়া ভালো। শেষে কোনো হিচ্ না হয়—'

খাটের উপর আধশোয়া অবস্থায় বসে রুচিরা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। দেখছিল বিকেল কেমন করে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায়, সন্ধ্যা কেমন অন্ধকারে। একটা হলদে রোদের ফালি কেমন এতক্ষণ ও-পাশের বাড়িটার গায়ে স্বপ্নের মত লেগে ছিল, কেমন আস্তে-আস্তে সেটা বেগনি হতে-হতে ছাই-ছাই রঙের হয়ে গেল। আর বুঝি তাকে দেখা যাবে না, খুঁজে পাওয়া যাবে না, মরা দেয়াল সেই মরা হয়েই থাকবে। হঠাৎ বাবার ডাকে ধড়মড় করে উঠল রুচিরা। চকিতে একটু টানাটান করে নিল শাড়িটা, ভঙ্গির শৈথিল্য-টাকে শাসন করল। আর কে একটা অচেনা বন্য জন্তু ঘরে ঢোকে তা দেখবার জন্যে দুই চোখের সন্দেহকে তীক্ষ্ণ করে তুলল।

ভাস্কর ঘরে ঢুকতেই জগৎপতি বললেন, 'বেশ নিরিবিলি আছে. তোমাদের বোঝাপড়াটা করে নাও নিশ্চিন্ত হয়ে। আমি যাই।' বলে তাকালেন রুচিরার দিকে : 'ইনিই সেই ভাস্কর। যে অর্থে সূর্য অন্ধকার দূর করে, আরোগ্য নিয়ে আসে, ও সেই অর্থেই ভাস্কর।' তার পরে ভাস্করের দিকে তাকিয়ে : 'বুঝতেই পাচ্ছ ইনিই রুচিরা, আমার মেয়ে, আমার একমাত্র সন্তান।' বলে আস্তে-আস্তে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন জগৎপতি।

ঘরের মধ্যে চুপ করে রইল দুজনে। স্তব্ধতা কোনো কালে এমন চেহারা নিতে পারে ভাবতেও পারত না কেউ। ঘরের মাঝখানে ভাস্কর দাঁড়িয়ে, আর রুচিরা খাটের উপর বসে, পিছন ফিরে, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। কেউ কাউকে চেনে না, কে কী বলবে বা কেমন করে বলবে জানা নেই, শুধু এক ঘর শূন্যতা এক পিণ্ড পাথর হয়ে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে। যেন কোথাও আরম্ভ নেই সমস্তটাই সমাপ্তি দিয়ে ভরা।

দূর ছাই, আমার বয়ে গেছে দাঁড়িয়ে থাকতে। চঞ্চল হয়ে উঠল ভাস্কর। যার কাঁদবার কথা, সাধবার কথা, মুক্তির মূর্তিমতী আকৃতি

হয়ে ওঠবার কথা সে বিমুখ হয়ে বসে থাকবে আর আমি ধানাই-পানাই করব এ অসম্ভব।

'দয়া করে পর্দাটা টেনে দিন।' মুখ না ফিরিয়েই বললে রুচিরা।

ভাস্কর চলে যাবার জন্যেই বুঝি এগিয়েছিল দরজার দিকে, এখন কথা শুনে পুরু করে পর্দাটা টেনে দিয়ে খাটের অনেক কাছে এসে দাঁড়াল।

'বসুন।' ঘাড় ফিরিয়ে হাত বাড়িয়ে চেয়ার দেখাল রুচিরা।

ভাস্কর বসল কাছাকাছি। বললে, 'কিন্তু আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন তবে কার সঙ্গে কথা কইব ?'

তবু নিঃসাড়ের মত বসে রইল অন্য মনে।

'ভাগ্যের প্রহারে আমাদের মুখ যতই বিকৃত হোক,' ভাস্কর বললে, 'আমরা সেই মুখেই পরিপূর্ণ সম্ভাষণ করব পৃথিবীকে ; আমরা পরাজিত নই কিছুতেই।'

রুচিরা মুখ ফেরাল।

সন্ধ্যা হব-হব করলেও ঘরে আলো ছিল, যে-আলোতে ধীরেসুস্থে সব কথাটাই বলে নেওয়া যায়। কিন্তু অস্থির হয়ে উঠল ভাস্কর, জিগগেস করল, 'আলোর সুইচটা কোথায় ?'

সেটা আবিষ্কার করা কিছু কঠিন নয়, শুধু পরোক্ষে জেনে নেওয়া আলো জ্বালতে রুচিরার আপত্তি আছে কিনা।

না, নেই। সুইচটা দেখিয়ে দিল রুচিরা।

আলোটা জ্বালতেই রুচিরা ঝলমল করে উঠল। সমস্ত ধূসর সোনার রং ধরল। উজ্জ্বল আর মধুর বেজে উঠল একসঙ্গে।

কিন্তু আলোতে তো শুধু দেখা নয়, নিজেকেও দেখানো। ভাস্কর তাকাল অন্যদিকে।

রুচিরা জিগগেস করলে, 'আপনি নতুন চাকরিতে জয়েন করেছেন ?

'করিনি এখনো।'

'দেখবেন।' যেন সাবধান করে দিচ্ছে রুচিরা। 'ভালো করে খোঁজ-খবর নিয়ে নেবেন।'

'খোঁজ-খবর ?'

'হ্যাঁ, যেন শেষে না ঠকেন।' দীর্ঘ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রুচিরা : চারদিকেই স্বার্থপরের ভিড়। আর, সেই টাকাটা পেয়েছেন ?'

'টাকা ?'

'যে নগদ দশ হাজার টাকা দেবার কথা—পাঁচ হাজার এখন আর পাঁচ হাজার পরে—দিয়েছে প্রথম কিস্তি ?'

'দেয়নি এখনো।'

'আগে নিয়ে নেবেন। নগদ নেবেন। আগাম নেবেন। চেক-টেক বিশ্বাস করবেন না।'

'না, না, সে কী, অবিশ্বাসের কী আছে ?' কুণ্ঠায় কালো হয়ে গেল ভাস্কর।

'তবু সাবধান থাকা ভালো।' কালো চোখের কোলে একটু বুঝি মমতার আভাস আনল রুচিরা : 'আগের চাকরিটা হুট করে ছেড়ে দেবেন না।'

'না, আমি কয়েক দিনের ছুটি নেব প্রথমে। ছুটি নিয়ে দেখব নতুন চাকরিটা সত্যি সরল কিনা, মজবুত কিনা।' হাসল ভাস্কর : 'ও সব আপনি কিছু ভাববেন না।'

যার সঙ্গে সম্পর্ক হবে, আশ্চর্য, তার সঙ্গে প্রথম আলাপে কী সব কথাবার্তা ! ভাগ্যকে বলিহারি। এমন কথা কোনো শাস্ত্রে, কোনো ইতিহাসেই বুঝি লেখা নেই। কিন্তু কী করা যাবে, আনন্দ তো আর সবার কাছে এক পোশাকেই আসে না। আনকোরা নতুন পোশাক যদি না পায়, বাসি মলিন পোশাকে এলেও কম সুন্দর লাগে না মাঝে মাঝে।

'তা ছাড়া, চাকরি বিপন্ন হলেও বা কী এসে যায় !' একটু বুঝি

স্ফূর্তির টান আনল ভাস্কর : 'এমন যার শ্বশুর তাঁর যোগ্য ব্যবস্থা হবেই।'

'শ্বশুর ?' হঠাৎ যেন চমকে উঠল রুচিরা।

'বাঙলা ভাষায় তো তাই-ই বলে জানি।'

চোখে পড়তেই হঠাৎ আবার মুখ ফিরিয়ে নিল রুচিরা।

'সেই কথাটাই তো আমি জানতে এসেছি আপনার কাছে।' চেয়ারটা আরো একটু কাছে টেনে আনল ভাস্কর : 'আমাকে কেন নির্বাচিত করলেন ?'

এতটুকু অপ্রস্তুত হল না রুচিরা। বললে, 'একজনকে নির্বাচিত করতে হতই।'

'কিন্তু আমাকে কেন ?'

'তা জানি না। আপনি বাবার নির্বাচন।'

'কিন্তু আপনার যিনি নির্বাচন ছিলেন তিনি কোথায় ?' ভাস্করের কথার টানে একটু বুঝি বা ঝাঁজ ফুটে উঠল।

'জানি না। শুনছি তিনি বিলেত চলে গিয়েছেন। এত বড় অসৎ, যাবার সময় দেখা পর্যন্ত করল না। দেখা করা দূরের কথা, জানালও না চলে যাচ্ছে। গিয়ে একটা চিঠিও লিখল না। অফিস থেকে নাকি পাঠিয়েছে, বাবা ঠিকানা এনে দিলেন। কত লেখালেখি, কত তার-বেতার, কোনো সাড়া নেই শব্দ নেই কিচ্ছু নেই—'

'তার নাম কী ?'

রুক্ষ রেখায় করুণ করে হাসল রুচিরা। বললে, 'সে যখন পুরুষ তখন তার নাম অদৃষ্ট। আর সে যদি মেয়ে হত নাম হত নিয়তি।'

ভাস্কর ভেবেছিল এইখানে রুচিরা কান্নায় ভেঙে পড়বে, যে অপমানের প্রতিবিধান নেই তারই বিরুদ্ধে নিষ্ফলের দেশে আর্তনাদ করবে। কিন্তু তা নয়, স্বরে দৃঢ়তা আনল রুচিরা। বললে, 'অদৃষ্ট

যখন জীবনকে ধরে বেঁধে মারে তখন জীবন সে অদৃষ্টকে অস্বীকার করতে চায়, অতিক্রম করতে চায়। শত মার সত্ত্বেও সেই বন্ধন মেনে নিতে চায় না, কিছুতে না। চায় বেরিয়ে আসতে। মুক্ত হওয়া মুক্ত থাকাই জীবনের একমাত্র কাম্য। আমিও তাই মুক্ত হতে চাই; আর সম্প্রতি আমার সেই মুক্তির উপায় আপনি।' অসঙ্কোচ দৃষ্টির পরিপূর্ণ প্রার্থনা এবার রাখল ভাস্করের মুখের উপর।

ভাস্কর বললে, 'এ ছাড়া আর কোনো উপায়, আর কোনো পথ ছিল না?'

'ছিল হয়তো কিন্তু কোনোটাই এ রকম সম্ভ্রান্ত বা নিরাপদ নয়। আপনি কি আমাকে আত্মহত্যা করতে বলছেন?' একটু হাসল রুচিরা।

'না, না, অসম্ভব।'

'বাঁচবার পথ যদি একান্তই না পাই তখন দেখা যাবে। আর শত দুঃখে-দৈন্যে জীবনে-বঞ্চনায়, সব অবস্থায়ই বাঁচবার পথ আছে এ আমার বিশ্বাস।'

'আমারও।'

'আরেক পথ ছিল সজ্ঞানে আইনের বিরুদ্ধতা করা, তাতে বাবার ভীষণ আতঙ্ক।'

'নিশ্চয়। তাতে শুধু মৃত্যুরই ভয় নয়, মৃত্যুর উপরে আবার জেলের ভয়।'

'আরো একটা পথ ছিল। সে হচ্ছে বাড়ি থেকে একেবারে পথে নেমে আসা। নিরাশ্রয় সাজা। তারপর কোনো হোম্-এ গিয়ে ওঠা। তা আমি যাব কেন?' অনেকক্ষণ খাড়া হয়ে বসে ছিল এবার একটু হেলান দিল: 'আমার এত বড় বাড়ি, এত সব বিষয়, এ আমি কেন ত্যাগ করতে যাব? জীবনের প্রথমে কোথাও একটা ভুল করেছি, তাই বলে কি বাকি জীবন ভোগের বার হয়ে

গিয়েছি? একটা তুচ্ছ হঠকারিতার শাস্তি কি সমস্ত জীবনটাকে পঙ্গু করে দেওয়া?'

'না, না, কিছুতে নয়।' সব দিক থেকে সায় দিতে পারছে জেনে শান্তি পেল ভাস্কর।

'তাই দেখছেন এ নতুন অভিনব পথটাই সবচেয়ে নিরীহ, সবচেয়ে মাননীয়।' ভঙ্গিটাতে আর একটু লালিত্য আনল রুচিরা।

শুষ্ক রেখায় হাসল ভাস্কর। 'কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, আমি এর মধ্যে এলাম কী করে? আমার কী যোগ্যতা ছিল!'

আহাহা, এ আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি? কথাটা বলেই মনে মনে নিজের গালে চড় মারল ভাস্কর। তোমার কাণাকড়িরও যোগ্যতা নেই। না বিদ্যা না বিত্ত না বৃত্তি না জন্ম। আর ঐ তো তোমার চেহারার ছিরি। তোমার একমাত্র যোগ্যতা তুমি গরিব, তুমি একটা হীনবস্থ কেরানি, তুমি একটা মোটাসোটা চাকরি পেলে বর্তে যাও, এক থোকে হাজার টাকা তুমি এখনো দেখনি, আর, সোনার মত সুন্দর এক লোচনলোভন তরুণী দেখলে তুমি লালায়িত হবে। জগৎপতি ঠিক তোমার পরিমাপ বুঝে নিয়েছেন। আর তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাড়ম্বরে শুনতে চেয়ো না।

'আপনি আদর্শবাদী, তাই বোধহয় আপনাকে বাবার ভালো লেগেছে।' রুচিরা কথাটাকে অন্য আলোয় রাখল। 'মনে হয়েছে নির্ভরযোগ্য।'

'আদর্শবাদী?'

'হ্যাঁ, সেই গোড়াতেই যে বললেন আমরা পরাজিত নই কিছুতেই, সেইখানেই তো আপনার আদর্শবাদের সুর। আর যারা আদর্শবাদী তাদেরই নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বাস করা চলে। বিশ্বাস করা চলে যে তারা কথা রাখবে, সর্তপালন করবে।' হাত দুটো তুলে মাথার পিছনে এনে রাখল রুচিরা।

'ও! বছর খানেক বাদে বিয়েটা ছেড়ে দিতে হবে সেই কথা বলছেন?' ভাস্করের বুকের মধ্যে মোচড় খেল: 'সেইটে কি এসেন-সিয়েল?'

'বা, সেইটেই তো সমস্ত কথা। সমস্ত কৌশলটাই তো আমার মুক্তির জন্যে। এতক্ষণ তবে কী বলছিলাম আপনাকে? মুক্তি— মুক্তি ছাড়া আর কী আছে!' আবার ভঙ্গি বদলে, লাবণ্যের নদীতে ঢেউ তুলে নড়ে-চড়ে বসল রুচিরা: 'আপনিই বলুন, মুক্তির মত আর দামী কী!'

'তাতো ঠিকই।' ভাস্করকে আবার সায় দিতে হল।

'নর্ম্যালি আপনার সঙ্গে আমার যুক্ত হবার কথা নয়, যা আমাদের সামাজিক বা সাংসারিক অবস্থা। আপনার সাময়িক সম্পর্কটা ধার নিচ্ছি শুধু আমার মুক্তি কিনে নেবার জন্যে। বলুন,' রুচিরার চোখ দুটো জলের ছোঁয়ায় চকচক করে উঠল: 'মুক্তির জন্যে কী মূল্য না দেওয়া যায়! তা ছাড়া—'

চোখ তুলে তাকাল ভাস্কর।

'তা ছাড়া, যে নষ্ট যে খল যে অসাধু তাকে আপনি নেবেন কেন? তার সঙ্গে জড়িয়ে আপনার সুন্দর পবিত্র জীবন কেন বিড়ম্বিত করবেন? না, কখনো না। আমিই তা দেব না হতে। নিজেকে বাঁচাতে পারিনি', চোখ নিচু করল রুচিরা: 'কিন্তু আপনাকে বাঁচাব।'

উত্তরে ভাস্কর কী বলবে? বাঁচবার কথায় বাঁচাবার কথায় কী বলার থাকতে পারে? আর জীবনকে সুন্দর রাখা, পবিত্র রাখা, অম্লান রাখা—এ সব তো উচ্চাঙ্গের কথা। এতে কারই বা আপত্তি? কিন্তু কেউ নষ্ট-ভ্রষ্ট হলেই সে একেবারে গ্রহণের অযোগ্য হয়ে যায় তাই বা কে বলে? বরং এখন, যেমন মনে হচ্ছে, কারু কারু বেলায় একটু দোষ একটু ত্রুটি একটু কালিমা থাকলেই বুঝি সে বেশি লোভনীয় হয়। তাকে তখন একটু ক্ষমার চোখে দয়ার চোখে শাস্তির

চোখে দেখতে হয় বলেই সে-দর্শনে রূপ বুঝি আরো বেশি ফোটে।

'আমি না হয় সব কথা গোড়াতেই বললাম, কিন্তু এমন যদি হত,' চোখদুটি বেদনায় নম্র করল রুচিরা ঃ 'বিয়ের পর আপনি প্রথম জানতে পারতেন যে আপনার স্ত্রী—' মুখ ফেরাল রুচিরা ঃ 'আমারই মত বন্দী, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করতেন না, নিশ্চয়ই তাকে তখুনি ত্যাগ করতেন, ছুটি দিয়ে দিতেন—'

'বলা যায় না কী করতাম!' সপ্রতিভ মুখ করল ভাস্কর ঃ 'রেখে দিতেও পারতাম।'

'কি, সর্ত থাকলেও?' প্রায় রুখে উঠল রুচিরা।

'না, সর্তের কথা আলাদা।'

'কিন্তু আমার বেলায় সর্ত আছে।' কালো কটাক্ষে হুঁশিয়ারির সঙ্কেত আঁকল রুচিরা।

'সে আমার মনে থাকবে।' উঠে পড়ল ভাস্কর।

'আপনি খুব ভালো।' কী বলবে, এ ছাড়া কী বললে আরো ভালো শোনাতে পারে রুচিরা ভেবে পেল না।

'কিন্তু—' যাই-যাই করেও তখন যাওয়া যায় না এমনি মনে হল ভাস্করের।

'কিন্তু, কী—' ভয়-ভয় চোখে তাকাল রুচিরা।

'কিন্তু, ধরুন,' হাসল ভাস্কর ঃ 'শেষ পর্যন্ত এমন যদি হয় আপনি সর্তটা এনফোর্স করতে চাইলেন না?'

'তার মানে?'

'তার মানে এই বিয়েটা আর ভেঙে দিতে চাইলেন না?'

'না, না, তা কেন?' খাঁচায় আটকানো পাখির মত রুচিরার বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠল। 'আমার চাওয়া-না-চাওয়ায় কী এসে যাবে? শুনুন আমি চাই কি না চাই, সমস্ত অবস্থাতেই আপনার সর্ত আপনাকে পালন করতে হবে।'

'তা তো ঠিকই। কিন্তু জানেন তো, সর্তটা কার্যকর করা সর্ত যে আরোপ করে তারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।'

'বুঝতে পাচ্ছি না।' জলে-পড়ার মত মুখ করল রুচিরা।

'ধরুন আমার ঘড়িটা আপনার কাছে রাখতে দিলাম। সর্ত করে দিলাম যে, সাত দিন পর আপনাকে সে-ঘড়ি ফেরত দিতে হবে। সাত দিন হয়ে গেল—'

অস্থির হয়ে উঠল রুচিরা। বললে, 'বা, তক্ষুনি-তক্ষুনি আমি ফেরত দেব।'

'কিন্তু ধরুন, কোনো কারণে আপনার যদি একটু ভুল হয়ে যায়, একদিন দেরি করে ফে[illegible]ন—'

'বা, সর্তের জোরে আপনি তা আদায় করে নেবেন।'

'আমিও তো তাই বলছি। যেহেতু সর্ত আমি আরোপ করেছি আমিই তা আদায় করব।' হাসি-হাসি মুখটা আরো সরল করল ভাস্কর: 'কিন্তু ধরুন, দেখলাম সে-ঘড়িটা আপনার পড়ার টেবলের উপর পড়ে আছে, কিংবা আপনার হাতে বাঁধা, তখন আমার ইচ্ছে হতে পারে, ও-ঘড়ি আমি আর ফেরত চাইনে, ও ঘড়ি আমি একেবারে আপনাকে দিয়ে দিলাম।'

'আমি তা নেব কেন?' প্রায় যেন জ্বলে উঠল রুচিরা: 'আমি আমার কথা রাখব। আপনার জিনিস ফিরিয়ে দেব আপনাকে।'

'আমি যদি না নিই আপনি কিছুই করতে পারেন না। ঘড়ি আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন বাইরে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন হাতুড়ি মেরে, যা খুশি তাই করতে পারেন, কিন্তু আমি হাত পেতে ফেরত না চাইলে আর ফেরত দিতে পারেন না আমাকে। তেমনি—'

'তেমনি, তেমনি কী?'

'তেমনি, এক্ষেত্রে সর্ত থাকা সত্ত্বেও আপনার ইচ্ছে হতে পারে

সর্তটা এনফোর্স না করি, যখন আচ্ছাদিত হয়েই গিয়েছি তখন বিয়েটা আর না ভাঙি। মোটকথা,' আনন্দের একটু রঙ ছিটোল কথায়ঃ 'মোটকথা বিয়েটা আপনার ভালো লেগে যেতে পারে।'

'তা কী করে হয়?'

'তা হয় না। হওয়া সম্ভব নয় উচিতও নয় হয়তো।' হাসল ভাস্করঃ 'তবু মানুষের মন আর সময়ের কথা কেউ বলতে পারে না। যার সঙ্গে নর্ম্যালি আপনার যুক্ত হওয়ার কথা নয়, তাকেই হঠাৎ ভালো লেগে গেল। বিয়ে ভাঙার কথা আর মনে রইল না।'

কী লোভী বোকা-বোকা দেখাচ্ছে লোকটাকে। কথাটা একেবারে ব্যক্তিগত করে তুলেছে। একটু আশ্বাস দিতে হয়, নইলে প্রেরণা আসবে কী করে? তাই রুচিরা ভাস্করের দিকে চেয়ে অপরূপ ইশারায় হাসল। বললে, 'সেই চান্স তো সব সময়েই আছে। ভালো যদি লেগে যায় তা হলে কে আর চলে আসে!'

'বলা যায় না। মাঝে মাঝে অসম্ভবও ঘটে যায় জীবনে।'

'নইলে আর জীবন কী!' হাসির ইশারার মদির একটা টান দিল রুচিরাঃ 'আমি চলে যেতে না চাইলেও হয়তো আপনি তাড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হবেন। আপনারই আমাকে অসহ্য মনে হবে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি, কখনো কখনো দরিদ্রের পেটে অমৃত সহ্য হয় না।'

'তখন দেখবেন সর্তটা ছিল বলেই বাঁচোয়া।' খাট থেকে নামবার উদ্যোগে একটি ভঙ্গুর ভঙ্গি করল রুচিরা।

বড্ড বেশিক্ষণ একসঙ্গে থাকছে না? এণাক্ষী এল তদারক করতে। এসেই এক মুহূর্তে আপাদমস্তক দেখে নিল ভাস্করকে।

'আমার মা' বলে পরিচয় করিয়ে দিল না রুচিরা। আর এণাক্ষীর মূর্তিতে এখন শুধু তিক্ততার ঝাঁজ। এমন ভাবে দেখছে ভাস্করকে যেন সেই আসামী অপরাধী।

'এখন আসি।' সিঁড়ির রাস্তা চিনে এসেছে, তাড়াতাড়ি নেমে গেল ভাস্কর।

'এই ছোঁড়াটা?' খোলা দরজার দিকে উগ্র চোখ পাঠাল এণাক্ষী।

জগৎপতি এসে সামিল হলেন।

'তুমি রাজ্যে আর লোক পেলে না? কোত্থেকে একটা বাজে-মার্কাকে ধরে এনেছ?'

'না, না, ছেলেটা ভালো।' জগৎপতি এক কথায় সেরে দিতে চাইলেন।

'কিন্তু কী কুচ্ছিত দেখতে! বেঁটে, মোটা, চোয়াড়ে-চোয়াড়ে চেহারা—'

'না, না, অমন কিছু মন্দ নয়। তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলো। বেশ সুস্থ সবল চেহারা। খাঁটি ছেলে। ভিত-বনেদ মজবুত।' এও জগৎপতি বাড়িয়ে বলছেন কিনা কে জানে।

'এ রকম একটা জংলিকে জামাই করবে?' প্রায় কেঁদে ফেললেন এণাক্ষী।

'এ তো আর চিরকালের জন্যে হচ্ছে না। বড় জোর বছর দেড়েকের জন্যে হচ্ছে। তারপর ছেড়ে দিচ্ছে রুচিকে, ভেঙে দিচ্ছে বিয়ে।' জগৎপতি দেখলেন রুচিরা অন্ধকারে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই এণাক্ষীর কিঞ্চিৎ সন্নিহিত হলেন, গোপনে কথা বলবার জন্যে। এমন একটা বিষয় কথা বলেও সুখ নেই। অথচ স্তব্ধতাটাও ভয়ঙ্কর। বললেন, 'এটা একটা কাগুজে বিয়ে, সমস্ত ব্যাপারটাকে আইনের চোখে সিদ্ধ করবার জন্যে। বিয়েটা যে ফের ভেঙে দেবে, ডিভোর্স করে দেবে সেটাও বৈধ ব্যাপার। আর তাহলেই রাহুমুক্তি। কেউ কোনো কিছু খুঁত ধরতে পারবে না, সম্ভ্রান্ততা সব দিক থেকেই বজায় থাকবে। জীবনে পূর্ণ হয়ে বাঁচবার নতুন হয়ে বাঁচবার আবার একটা

সুযোগ পাবে রুচিরা। সেই সুযোগ ওর জন্যে আবার তৈরি করে দেব। একবার ভুল করেছে বলে আরো একবার করবে না নিশ্চয়।'

'বুঝলাম। কিন্তু ধরো', চোখ মুখ ঘোরালো করল এণাক্ষী: 'যদি ও রুচিকে ছেড়ে না দেয়!'

'ছেড়ে না দেয়?'

'যদি ডিভোর্স না করে! বিয়ে না ভাঙে! আইনে তো তুমি ওকে বাধ্য করতে পারবে না। কি, পারবে?'

'না। তা পারব না। শুধু ওর মুখের কথা। ব্যাপারটা কাগজে-কলমে উঠে কাগজে-কলমেই কাটা পড়বে—এই ওর প্রতিশ্রুতি। আমি জানি', জগৎপতি ভরাট গলায় বললেন, 'ও ওর কথা রাখবে।'

'সকলেই সব কথা রাখল! কিন্তু ধরো যদি না রাখে! যদি বউ আটকায়!' বিভীষিকা দেখল এণাক্ষী।

'তখন অন্য পথ দেখতে হবে। মোটকথা, যে করে হোক', চিবুকে কুটিল রেখা ফেললেন জগৎপতি। 'আনতেই হবে ছাড়িয়ে।'

'কিন্তু যদি কোনো কারণে আনতে না পারো, আর যদি ঐ কদাকার লোকটাই পার্মানেণ্ট জামাই হয় আমি পাগল হয়ে যাব।' এণাক্ষী হাঁসফাঁস করে উঠল। 'নিশ্চয়ই টাকা দিয়েছ ওটাকে?'

'একটা ভদ্রস্থ চাকরি দিয়েছি। বেশ কিছু নগদ টাকাও দেব বলেছি। নইলে ওর উৎসাহ হবে কেন? ও কেন এগিয়ে আসবে? কেন ঝক্কি পোয়াতে রাজি হবে? কখনো-কখনো মানুষের সদগুণকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যেও টাকা কাজ করে। কখনো-কখনো টাকা পাবে বলেই মানুষ পরোপকারী সাজে। আগুনে পর্যন্ত ঝাঁপ দেয়।'

'তার মানে', কান্নার সুর আনল এণাক্ষী: 'লোকটা টাকাও খাবে মেয়েটাকেও আটকাবে। আমি তাহলে আত্মহত্যা করব।'

'অত সোজা নয় আত্মহত্যা।' জগৎপতি অলক্ষ্যে বুঝি একবার

অন্ধকার বারান্দার দিকে তাকালেন। বললেন, 'তুমি ঘাবড়িয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাস্কর কথা খেলাপ করবার মত ছেলে নয়।'

'আমি বলি কী, তুমি ওরকম গরিব-গুরবো কেরানি-ক্লাশ না ধরে একটি সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্র শিক্ষিতকে ধরো—যেমন সাধারণ অবস্থায় হলে ধরতে। সেইখানে টাকা ঢালো। সেইখানেই মানিয়ে নেওয়াও।'

'এই না হলে মেয়েলি বুদ্ধি!' অন্ধকার বারান্দাকেই বুঝি আবার লক্ষ্য করলেন জগৎপতি: 'এমনিতে যে উপযুক্ত পাত্র সে জেনেশুনে কিছুতেই রাজি হবে না। শুধু টাকাই তার আকর্ষণের বস্তু হবে না কখনো। আর যদি তুমি লুকিয়ে বিয়ে দিতে চাও পরিণাম ভয়াবহের চেয়েও বেশি হবে। তাছাড়া বিষয়টাকে ব্যক্ত করে কতজনের কাছে তুমি যাচাই করবে শুনি? জানাজানি হয়ে শেষ পর্যন্ত বার লাইব্রেরিতেও ঢি-ঢি পড়ে যাবে। যে পথটা আমি ঠিক করেছি সেইটেই সব চেয়ে বিচক্ষণ। লো-ক্লাশ গরিব কেরানিই টাকার জন্যে উত্তেজিত হবে। আর এখানে জানাজানির ভয় ডর কিছু নেই গোড়াগুড়ি থেকেই দলিলে-প্রমাণে নিখুঁত।'

'তারপর ডিভোর্স হয়ে যাবার পর?'

'তখন আবার নতুন পরিচ্ছেদ।' বললেন জগৎপতি, 'এমনিতে হ্যাণ্ডিক্যাপড মেয়ের চেয়ে ডিভোর্সড স্ত্রীর বাজারদর অনেক বেশি। বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসে রুচিরা আবার নতুন করে পাত্রস্থ হবে। নতুন করে পৃষ্ঠা ওলটাবে।'

'ভগবান জানেন কী হবে!' এণাক্ষী বারান্দা থেকে মুখ সরিয়ে আনল ঘরের মধ্যে। বললে, 'একটিনি করবার জন্যে যে ছেলেটাকে ঠিক করেছ সেটায় রুচিরার মত আছে তো?'

'আর মতামত!' নিশ্বাস ফেললেন জগৎপতি: 'এখন তো পাত্র

লক্ষ্য নয়, এখন লক্ষ্য শুধু তিনটে দলিল। এক বিয়ের, দুই বার্থ-রেজিস্ট্রেশানের আর তিন বিচ্ছেদের ডিক্রির। পাত্র ফুটোই হোক আর আস্তই হোক কী যায় আসে।'

'কিন্তু যা করতে হয় তাড়াতাড়ি—'

'তাতে আর সন্দেহ কী।' উঠে পড়লেন জগৎপতি।

১১

আপিস থেকে ফিরে ভাস্কর দেখল মা খুব মনোযোগের সঙ্গে একটা চিঠি পড়ছে। লম্বা চিঠি।

'আপনার ছেলেকেই জিগগেস করবেন।' শেষদিকটায় চলে এসেছে মহালয়াঃ 'সে যদি মানুষ হয় নিশ্চয়ই সে সমস্ত স্বীকার করবে। অসহায় মেয়েকে বাপের বাড়ি ফেলে সরে পড়বে না। অবিলম্বে বিয়ে করে নিজের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবে। আপনি মহীয়সী মাতার মত আপনার ছেলেকে আশীর্বাদ করবেন।'

'কে লিখেছে চিঠি?'

'নাম নেই।'

'নাম নেই? বেনামী চিঠি কে লিখল?' হাত বাড়াল ভাস্কর।

'পড়ে ছাখ—' মহালয়ার মুখ থমথম করতে লাগল।

সমস্ত মিথ্যে। ভাস্কর চিৎকার করে উঠবে এই আশা করছিল মহালয়া, কিন্তু কী আশ্চর্য, ভাস্কর চুপ করে রইল। শুধু নিজের মনে বলে উঠলঃ 'আমিই তোমাকে সব বলতাম।'

'তাহলে এ সব যা লিখেছে সত্যি?'

হাঁ-না কিছুই বলল না ভাস্কর। চুপ করে রইল।

তার মানে তাই।

মহালয়া নিশ্বাস ছাড়ল। মুখে খুশি-খুশি ভাব করলঃ 'তাহলে আর দেরি করছিস কেন? আমার গোপাল এসেছে। গোপালকে নিয়ে আয় উদ্ধার করে।'

এক স্তূপ পাথরের মত অনড় হয়ে বসে রইল ভাস্কর। গায়ের জামাটা খুলে ফেলার কথাও ভুলে গেল।

'তাই সেদিন এই ভালো চাকরিটা জুটিয়ে দিল।' পাশের ঘরে যেখানে ঠাকুর আছে সেদিকে লক্ষ্য করে মহালয়া বললে, 'সবই

গোপালের ইচ্ছে। গোপালের দয়া।' যুক্তকরে প্রণাম করল মানসবিগ্রহকে।

এর মধ্যে যে অনিয়ম আছে সহসা দেখতে চাইল না। তবু চোখ এড়াল না ভাস্করকে কেমন যেন একটু শীর্ণ একটু নিস্তেজ দেখাচ্ছে। তাই একবার মহালয়াকে বলতে হল : 'এ যে কেমন করে হল কেমন করে হয় কে বলবে।'

এবারও চুপ করে থাকাই উচিত ছিল হয়তো কিন্তু অন্য অথে সত্যের সুর আনল ভাস্কর। 'কখন কী করে যে কী ঘটে যায় কেউ জানে না।'

'তা যা হবার তাই হয়েছে। এখন তা নিয়ে কথা বলা বৃথা।' ভাস্করের কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল মহালয়া : 'নতুন চাকরিতে তোর মোট কত মাইনে বাড়ল ?

'প্রায় দু শো।'

'আমি বলি কী, এবার একটু ভালো দেখে বাড়ি ভাড়া কর।' নিজেই তার কারণ দেখাল মহালয়া : 'নতুন বউ আসবে বাড়িতে।'

মাকে আরো একটু উৎসাহিত করতে লোভ হল ভাস্করের। বললে, 'তা ছাড়া যৌতুক বাবদ পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিচ্ছেন।'

'বলিস কী! পাঁচ হাজার ?' প্রায় ভোর রাতের স্বপ্নের মত মনে হল মহালয়ার : 'ফার্ণিচার দেবে না ?'

'তাও বা কোন না-দেবে!'

'তবে সে সব ঢোকাবি কোথায় ? তাই বলছিলাম বাড়িটা বদ্‌লা। একটু ছিমছাম বড়সড় দেখে ঠিক কর। শ্বশুরকে বললে সেই ঠিক করে দেবে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, বাপ তার জন্যে কিছু অভাব রাখবে না।' জাহাজ সত্যি কোন বন্দরে এসে থামছে, পারের কাছে এসে খানিক বুঝি আভাস পেল মহালয়া, আলোয়-আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, বললে, 'নিজের ইচ্ছেয় বর বেছেছে মেয়ে, তার

সে-ইচ্ছেকে মেনে নিচ্ছে, মান দিচ্ছে। আর সে মেয়েই তো এক-মাত্র ওয়ারিশ। তার মানে তুই—তুই-ই সমস্ত কিছুর মালিক হবি ?'

'গোপালই সমস্ত কিছুর মালিক হবেন।' হাসল ভাস্কর।

'গোপাল—সে তো আমারই গোপাল।' আবার যুক্তকর হল মহালয়া।

যেন একটা সাম্রাজ্য জয় করা হয়েছে এমনি এখন মনোভাব মহালয়ার। শেষ যদি ভালো হয় তাহলে পথের ভালো নিয়ে আর কে মাথা ঘামায় ? পথ যতক্ষণ পথ ততক্ষণই মতামত, পথ যখন প্রাপ্তিতে এসে পৌঁছয় তখন একমাত্র আওয়াজ—জয়ধ্বনি। সাফল্যই পথের একমাত্র বিচার।

সান্ধ্য-খেলাধুলা সেরে সোমনাথ বাড়ি পৌঁছুতেই মহামায়া উথলে উঠল : 'জানিস তোর দাদার বিয়ে হচ্ছে ?'

মার মুখে চোখে আনন্দ উপচে পড়ছে বটে কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা আনন্দের না আতঙ্কের বুঝতে পারল না সোমনাথ। শুধু বললে, 'সত্যি ?'

'কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে জানিস ?'

'কার সঙ্গে ?' সোমনাথের কী জানবার থাকতে পারে কে জানে।

'সেই যে মিলিটারির সঙ্গে লড়েছিল তার সঙ্গে।'

'সত্যি ?' উচ্ছ্বাসে এবার সোমনাথই ছাপিয়ে পড়ল : সেই মেয়েটা ?'

'মেয়েটা—মেয়েটা কী ? শাসন করতে চাইল মহালয়া।

আর কী বলা যায়, কী ভাবে বলা যায় জানে না সোমনাথ। চোখ দুটো কপালে রেখেই বললে, 'সে যে মা সাংঘাতিক সুন্দর দেখতে।'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।' সায় দিল মহালয়া।

'তুমি দেখেছ ?' ভাস্কর জিগগেস করল।

'সেই এক দিন দেখেছি। যেদিন ওদের সেই তিনতলার ভাড়াটে নিয়ে গোলমাল হয়—সেই দিন দেখেছিলাম রাস্তায়।' কী যে অপূর্ব সেদিন দেখেছিল তা প্রকাশ করবার মত ভাষা কোথায় মহালয়ার, চোখে মুখে কপালে ভ্রূতে তারই ছবি আঁকল।

'আমি কত বার দেখেছি।' সুতরাং তারই বলবার অধিকার বেশি এমনি ভাব করল সোমনাথ। 'আর, মা, সাংঘাতিক বড়লোক।'

'সেই বড়লোক এখন আমাদের আপনার লোক হবে।' এ নাটকে সোমনাথের কোনো অংশ নেই, তবু তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে তাকে একটু আদর করল মহালয়া।

'কিন্তু জানো মা, আমাদের দলের ছেলেরা বলে, ও খুব অহঙ্কারী।'

'ও কে ?' মহালয়া আবার শাসনের ভুরু তুলল।

'যে আমার বৌদি হবে।' লজ্জার ভাব করল সোমনাথ।

'সে বুঝি ও হয় ?'

'আর কী সর্বনাম আছে ?' লজ্জার ভাব কাটিয়ে উঠল সোমনাথ ঃ আগে বৌদি হোক পরে উনি বলা যাবে।'

'কিন্তু তুই অহঙ্কারের কী বুঝিস ?' পাড়ার চোখ থেকে দেখা কোনো নতুন আলো ফেলতে পারে কিনা সোমনাথ জানতে কৌতূহল হল ভাস্করের।

সোমনাথ কথার কথা একটা বলেছিল মাত্র, চুপ করে গেল। মহালয়া বললে, 'যে এত সুন্দর দেখতে, যার এত টাকা-পয়সা, তার একটু অহঙ্কার থাকবে এ আশ্চর্য কী। তার একটু অহঙ্কার না থাকলে যেন মানায়ও না। তা ছাড়া ধনী-গুণী বাপের মেয়ে লেখা-পড়াও শিখেছে নিশ্চয়—'

'বা, বি-এ পাশ করেছে।' এবার ভাস্করই বুঝি একটু গর্বের টান দিয়ে বসল।

'তারপর আবার বি-এ পাশ!' মহালয়ার প্রায় লটারিতে টিকিট পাবার মতন হল: 'ভগবানের এক সঙ্গে এত দয়া খুব কমই হয়। এত দয়া, এত দান!'

'তা ছাড়া এখানকার তরুণ সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারি।' ভাস্কর বললে, 'ভীষণ পপুলার। কত পরোপকার করেছে, করতে চেষ্টা করেছে, সবাই একবাক্যে প্রশংসা করে।' কেন যে অপবাদ খণ্ডন করতে চাইছে, কার জন্যে, নিজেই যেন ভেবে পেল না ভাস্কর। তবু বললে, 'সেবা করতে বস্তিতে বস্তিতে পর্যন্ত গিয়েছে, মজুরদের জন্যে নাইট-ইস্কুল খুলেছে—'

'যদি অহঙ্কারই থাকবে তাহলে জেনে-শুনে সব ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়ে গরিবের ঘরের বউ হতে রাজি হয় না।' শেষ রায় দিয়ে দিল মহালয়া।

কোন জানলার কোন কোণে দাঁড়ালে ঐ বড়লোক বাড়িটার চিলতে আভাস পাওয়া যায় সোমনাথের জানা আছে। এখন অন্ধকারে কিছু ধরা যাচ্ছে না বটে কিন্তু আকাশের কোন জায়গায় সেই প্রাসাদ, অনুমান করে নিতে দেরি হল না। মনে মনে সেই রঙের প্রাসাদটাকে হাত বাড়িয়ে ধরল সোমনাথ। একেবারে টেনে নিয়ে এল তার ছোট্ট ঘরের মধ্যে।

পরামর্শে সন্নিহিত হল মহালয়া। 'কী ভাবে বিয়েটা হচ্ছে?'

'বুঝতেই পাচ্ছ—সনাতন পথে নয়, চোরাগলিতে। মানে রেজেস্ট্রি করে। আলো নেই বাজনা নেই মিছিল নেই বরযাত্রী নেই। আর জানো তো', মায়ের হঠাৎ নিবে-যাওয়া মুখের দিকে তাকাল ভাস্কর: 'এটাই আজকালকার হিসেবে সব চেয়ে সভ্য রীতি।'

'তা মেয়ের বাড়িতে উৎসব হবে না? প্রীতিভোজ?'

'না হওয়ারই সম্ভাবনা। শত হলেও ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছে তো।'

'তার মানে ?'

'মানে মেয়ে তো আর বাপের মত নিয়ে পতি নির্বাচন করেনি।' বললে ভাস্কর, 'আর সে-নির্বাচন বাপের মাপকাঠিতে নিশ্চয়ই কিছু আহা-মরি নয়, তাই—'

'তা বাপ কী করবে ? মেয়ে যখন ভালোবেসে একজনকে সম্পুর্ণ বরণ করে নিয়েছে—'

'তাই তো বাপ পারল না অস্বীকার করতে। কিন্তু তার অভিমান হওয়া তো স্বাভাবিক। তাই কোনো উৎসব হবে এমন মনে হয় না।'

'কিন্তু আমার এখানে ?'

'বলো কী করতে হবে ?' ঢোঁক গিলল ভাস্কর: 'যেখানে দস্তখৎ করে বিয়ে সেখানে আবার সামাজিকতা কী। লোকজন খাওয়ানোর কথা তুলো না।'

'তা তুলছি না। কিন্তু বিয়ের পর যেদিন বউ এনে ঘরে তুলবি সেদিন—সে সময়টায় আত্মীস্বজন থাকবে না কেউ ? না বললে তারা আসবে কেন ?' মহালয়ার স্বরে কান্নার ছোঁয়াচ লাগল।

'কাকে-কাকে বলতে চাও ?'

'কেন, তোর মাসিমারা আছে, জেঠতুতো দিদি বৌদি আছে—'

'তারা কী করবে ?'

'কেন, বউ ঘরে আসার সময় বউ-বরণ করবে, কিছু মাঙ্গলিক করবে, আশীর্বাদ করবে, বউয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেবে, বউয়ের মত করে একটু সাজাবে-গোজাবে—আগের থেকে তো তৈরি হয়েই আপিসে যাবে না, আর আপিসে, যেখানে বিয়ে হবে, সেখানে কি সিঁদুর আছে, না প্রসাধনের জিনিস আছে ?'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' হাসতে লাগল ভাস্কর।

'কি, আপিসেই তো বিয়ে। আর সেখান থেকেই তো সটান বউকে বরের বাড়ি নিয়ে আসা।'

'তাছাড়া আবার কী। তবে বেশি লোক ডেকো না। ঐ যা বললে, মাসিমা, দিদি আর বউদি—'

'আর পাড়ার মধ্যে যারা আছে?'

'তারা তো পর্দার ফাঁকে উঁকি মারতে আসবে।'

'কিন্তু ফুলশয্যে?'

ফুলশয্যে, না, ভুলশয্যে! কথাটা জিভের ডগায় এসেছিল, রুখে দিল ভাস্কর। বললে, 'ও সব হাঙ্গামা বাধিয়ো না। একে ছোট বাড়ি, জায়গা নেই, তায় দিন-কাল ভালো নয়।'

'দিন-কাল ভালো নয় মানে?'

'ভালো নয় মানে যারা সভ্য ভব্য, প্রোগ্রেসিভ, তারা ও রকম শয্যে-টয্যে করে না। করলেও লোক ডেকে করে না।'

'বা, সকলকে ডেকে এনে আমি দেখাব না আমার ভাস্করের কেমন বউ হল? বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এসে কেমন বসেছে মাটির ঘরে।'

'যার অদৃষ্টে যখন আছে তখন দেখবে।'

'বা, ফুলশয্যের রাত ছাড়া আবার কখন দেখবে? লোকে জিগগেস করলে আমি বলব কী—'

'কিছু বলতে হবে না। যদি বলতে হয় বলে দিও, ও সব লাগে না, ও সব আগেই হয়ে গিয়েছে।' বলেই উচ্চরোলে হেসে উঠল ভাস্কর। হাসিটা যেন ব্যঙ্গের হাসির মত শোনাতে চাইল, কিন্তু নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করছে এটা কেমনতরো? তাই হাসিটা তাড়াতাড়ি পিষে ফেলে বললে, 'সামান্য কটা যা টাকা পাওয়া যাবে তা যদি ধরে রাখতে না পারি তাহলে কী লাভ!'

মহালয়া নিরস্ত হল। জিগগেস করল, 'বিয়েটা কবে?'

'নোটিশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর দিন-বারো পরেই মেয়াদ যাবে নোটিশের। তার পরেই তারিখ ঠিক হবে।'

'তারিখটা আমি জানতে পারব তো?' যেন অনেক কিছু

জানায়নি, অনেক কিছুই গোপন করা হয়েছে সেই অভিমানই যেন প্রচ্ছন্ন।

'বা, বউ নিয়ে ঘরে ঢুকব সেদিন, তোমাকে প্রণাম করব দুজনে, আর তুমিই তারিখ জানতে পারবে না?'

মহালয়ার অভিমান জল হয়ে গেল। তরল মুখে বললে, 'দু-দিন আগে যেন জানাস। ওদের খবর দেব তো বউ দেখতে আসতে।'

হ্যাঁ, দিন ঠিক হয়েছে। আগামী বুধবার। বুধবার দুপুর। বউ নিয়ে বাড়ি আসতে ধরো, বিকেল তিনটে-চারটে।

'আমি ওদের সকালে এসেই না হয় থাকতে বলব।' সময়ের গণ্ডি আরো একটু বাড়িয়ে দিল: 'রেখে দেব সন্ধে পর্যন্ত।'

সোমনাথ অবশ্যি সেই দিন থেকেই রাষ্ট্র করছে—জগৎপতিরও সেই মত, কিছু দিন আগে থেকেই রাষ্ট্র হওয়া ভালো—বেশ তো, যদি কারু কিছু বলবার থাকে, আপত্তি করবার থাকে, নোটিশে প্রতি-বাদী হও, দেখা যাবে হয়-নয়। আপিসেও বিয়ের কথা শুনতে পেল ভাস্কর। সবাই তার ভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। লোকে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব পায়, কিন্তু এ যে দেখি রাজকন্যা আর পূর্ণ রাজত্ব। আর জগৎপতি কত উদার। প্রেমকে সম্মানিত করবার জন্যে কত সে মুক্তপ্রাণ, কত সে মহানুভব!

কিন্তু সে বুধবার কতদূর?

কে একজন এক দিনের জন্যে রাজা হয়েছিল, ভাস্কর এক বছরের জন্যে স্বামী হবে! এক বছর কি কম সময়? এক বছরের পরেও চাকরিতে কিছুটা এক্সটেনসন হতে পরে। সেটা উপরি পাওনা। সমস্তটাই উপরি পাওনা। চাকরি, টাকা, এই লোভনীয় সান্নিধ্য। এই অনাবৃত অধিকার। ছোঁয়া যায় না এমন একটা আগুনের শিখাকে কয়েক রাত্রির জন্যে শয়নশিয়রের প্রদীপ করা যাবে এ কে জানত। ভাষায় এমন কত শব্দ আছে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই, সে

সব শব্দ এবার উচ্চারিত হবে। কত সুর আছে যা রক্তে আনবে অজানা যন্ত্রণা ; কত রহস্য আছে যা শত সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদেও পৌঁছুতে দেবে না তার সমাপ্তিতে। এ কী এক অসহ্য জাগরণ ! সমস্তটা ক্ষণস্থায়ী বলেই যেন এত তীব্রস্বাদ। ট্রেনটা ছাড়তে ছাড়তেই পৌঁছে যাবে তারই জন্যে এত ত্বরা এত দাহ, এত ইচ্ছা।

দুপুরের দিকেই চলে এসেছে রাঙা-মাসি, কিছু পরেই গিনি-দিদি আর মলয়া-বৌদি এক সঙ্গে।

মলয়া বৌদি বললে, 'কতই যে তোমরা আরো দেখাবে।'

সায় দিল ভাস্কর ঃ 'হ্যাঁ, এ তো শুধু ভূমিকা।'

মলয়া-বৌদি আলপনা আঁকতে চাইছে, ভাস্কর মত দিচ্ছে না। বলছে, 'কাগজে-কলমের ব্যাপার, তার মধ্যে আবার শিল্পকলা কিসের ?'

মানতে চাইছে না মলয়া, বলছে, 'সবটাই কি খবরের কাগজ, একটু কবিতা-টবিতাও তো থাকবে।' পিটুলি-গোলা নিয়ে বসে গেল মলয়া।

দুপুর দুটো নাগাদ গাড়ি পাঠালেন জগৎপতি।

'সেই গাড়িই যখন পাঠাল তখন ফুল-টুল দিয়ে একটু সাজিয়ে দিল না কেন ?' মলয়া ঢলে পড়ল হাসিতে।

'আহা, আমি কনের বাড়িতে আসর করে বিয়ে করতে যাচ্ছি কিনা।' ভাস্কর বললে।

'তবু বিয়ে করতেই তো যাচ্ছ। আর গাড়ি দেখে বুঝছি পাত্রী-পক্ষেরই নিমন্ত্রণে। কিন্তু যাই হোক, গাড়ির সাজ না থাক, তোমার সাজ থাকবে না কেন ?' মলয়া ব্যস্ততার ভাব দেখাল ঃ 'জংলি শার্ট আর প্যাণ্ট পরে তোমার যাওয়া চলবে না, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যাও।'

'আপিসের বিয়ে আপিসি পোশাকেই হওয়া উচিত। এ তো তবু আমি বিয়েতে ফুলপ্যাণ্ট আর বুশ-শার্ট পরে যাচ্ছি, কদিন পরে

দেখবে পুজুরি পুরোতেরা হাফ-প্যান্ট আর তোয়ালে-গেঞ্জি পরে পুজোয় বসেছে।' আগের কথাটা আবার নাটকীয় ভাবে আওড়াল ভাস্কর : 'এ তো শুধু ভূমিকা।'

গাড়িতে গিয়ে উঠেছে, গিনি-দিদি পিছু ডাকল। 'সে কি, মা-মাসিকে প্রণাম করে যা।'

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে ভাস্কর বললে, 'বা, আপিস যাবার সময় আমি প্রণাম করে যাই নাকি? এও তো আপিসেই যাওয়া।'

ড্রাইভারকে জিগগেস করল, 'কোথায় যাবে?'

ড্রাইভারটাও উদ্ধত। কথার উত্তর দিলে না। ভাবখানা এই দেখতেই পাবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।

গাড়ি এসে জগৎপতির বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

ভাস্কর নামল না। হর্ণ বাজিয়ে মালিকদের সজাগ করা অসভ্যতা তাই ড্রাইভার নিজেই খবর দিতে চলল। দরকার নেই। রুচিরা আগে থেকেই তৈরি। ড্রাইভার পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই এল গেট খুলে।

যে দিকে ভাস্কর তার অন্য দিকের দরজা খুলে গাড়িতে উঠল রুচিরা।

ভাস্কর জিগগেস করলে, 'কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনি?'

'এই কেটে যাচ্ছে এক রকম।'

গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

একটু বা চঞ্চল হল ভাস্কর। বললে, 'আর কেউ যাবে না?'

'হ্যাঁ, বাবার দুজন জুনিয়ার উকিল, রয় আর বাসু, তাঁরা আসছেন ঐ পাশের গাড়িটাতে। তাঁরা সাক্ষী হবেন।'

'ঠিক আছে।' নাটকে তার কত বড় একটা বিশিষ্ট পার্ট এমনি প্রধানত্বের ভাবে ভাস্কর নড়ে-চড়ে বসল।

সজ্ঞানে তাকালও রুচিরার দিকে। এতটুকুও সাজগোজ করেনি। একটা ফুল নয়, একটু রঙও নয়, একটু হাসি নয়। বা, কী করে তুমি আশা করতে পারো? কোথাও কিছু আশা করবার নেই জেনেও অবাধ্য মন আশা করে। তাকে না হয় শাসন করলাম, কিন্তু দুটো কৃতজ্ঞতার কথাও তো বলতে পারে। আপনি কত ভালো, কত মহৎ, আপনার জন্যেই ফাঁসির দড়িটা খুলতে পারলাম গলা থেকে, এ জাতীয় দু-একটা কথা। সেদিন কত কথাই তো হল, আজ একেবারে পাহাড়ে নিশ্চুপ। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে যেন ভাস্কর কোথাকার কে এক বিদেশী। কোনো দিন তার নামও শোনেনি রুচিরা।

ভাস্করও কথা বলল না।

দশ মিনিটের মধ্যেই সই-সম্পাদন হয়ে গেল। একই মোটরের দুই প্রান্তে-বসা নিঃশব্দ আরোহী স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেল।

রয় আর বাসু বললে, 'আমরা তা হলে চলি।' তারা অতশত কী জানে, গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে বললে, 'আপনারা সুখে-শান্তিতে থাকুন। উইশ ইউ গুড লাক।'

'ওঁদের একটু খাইয়ে দিতে হয়।' ভাস্কর তাকাল রুচিরার দিকে: 'কী বলো, ডাকব?'

রুচিরা ভুরু কুঁচকালো। বললে, 'যা না বিয়ে তার আবার ভোজ। রাখুন, ডাকবেন না কাউকে।'

'এ তো ভোজ নয় এ সামান্য ভদ্রতা।'

'ভদ্রতার কারু দরকার নেই। কাজ হয়ে গিয়েছে, উঠুন, এখন বাড়ি চলুন।'

আগে রুচিরা, পরে ভাস্কর উঠল। বিয়ের আগে যেমন ব্যবধান রেখে বসেছিল বিয়ের পরেও সেই ব্যবধান। বিয়ের আগে যেমন চুপচাপ করে এসেছে বিয়ের পরেও সেই চুপচাপ।

'শোনো তোমাকে একটা কথা বলি।' ভাস্কর মাস্টার-মাস্টার মুখ করল।

'বলুন।'

'মনে হচ্ছে তুমি আমাকে আপনি বলে বলতে চাও।'

'আমারও ইচ্ছে আপনিও আমাকে আপনিই বলুন।'

'অসম্ভব। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে আপনি বলে বলেছে ভূভারতে এমন কথা কেউ শোনেনি।'

'বেশ, আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোট, আপনি আমাকে ডাকতে পারেন 'তুমি' বলে। কিন্তু, মাপ করবেন, আমি পারব না।'

'শোনো, আমাদের বাড়িতে যখন যাচ্ছ তখন সবার সামনে আমার সঙ্গে যদি কথা বলো, তেমন কথা বলার অবকাশ অবশ্যি কম, দয়া করে 'তুমি' বোলো—খবরদার, 'আপনি' বোলো না।'

'কেন?'

'আমাদের বাড়িতে সকলে জেনেছে, মানে অনুমান করেছে, তুমি আমার প্রেমে পড়ে আমাকে বিয়ে করছ। একমাত্র প্রেমই অযোগ্যকে রাজমুকুট পরাতে পারে, নইলে আমার মত অক্ষম-অধম লোক কী করে তোমার মালা পায়? সেক্ষেত্রে তারা যদি দেখে তুমি আমাকে 'আপনি' বলছ, তারা ভড়কে যাবে। তারা অনেক কিছু অঘটন সরল মনে মেনে নিতে পারে, কিন্তু যুবক-যুবতী পরস্পরকে 'আপনি' বলে প্রেম করছে ও বিয়ের পরেও 'আপনি' চালাচ্ছে—এতটা এদের সহ্য হবে না। এরা তাহলে সন্দেহ করবে, সুন্দর করে একটা বাগান সাজিয়েছি এত দিন—তছনছ করে ফেলবে।'

'কিন্তু', কুটিল ভুরু কুটিলতর করল রুচিরা। বললে, 'কিন্তু আমাকে আপনাদের বাড়িতে যেতে হবে কেন?'

'বা, বিয়ের পর বউকে নিয়ে বর বাড়ি যায় না? তেমনি এখন নিয়ে যাব তোমাকে।'

'বউ, কে বউ?'

'তুমি।' ছেলেমানুষের মত গোবেচারা মুখ করল ভাস্কর: 'আমার বউ।'

'আমাদের এটা বিয়ে নাকি? এটা একটা ছল।'

'সমস্তই ছল। সে না হয় আমি-তুমি জানলাম, কিন্তু অন্য লোক জানে কেন?' অবাধ্যকে বোঝাবার মতন করে শান্ত স্বরে ভাস্কর বললে, 'লেপাফা যখন হয়েছে তখন তাকে দোরস্ত রাখাই দরকার।'

'তার মানে আমরা যে স্বামী-স্ত্রী এটা প্রকাশ্যে দেখিয়ে বেড়াতে হবে?'

'অন্তত আজকের দিনে তো একটু দেখানো দরকার—আমার মাকে আমার দিদি-বৌদিকে।' আপোসের ভাবই বজায় রাখছে ভাস্কর: 'তাঁরা আশা করে পথ চেয়ে বসে আছেন।'

'মাপ করবেন। যা মিথ্যে তা সত্যি করে জানাবার কোনো দরকার নেই।'

'মিথ্যেকে মিথ্যে বলেই জানাতে বলছ? তাহলে তো আদ্যো-পান্ত, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্তই জানাতে হয়। সেটা কি তোমার পক্ষে, তোমার বাবার পক্ষে সুবিধের হবে?'

'কিন্তু, বলতে চান, সমস্তটাই কি ভিত্তিহীন নয়?' রুচিরাকে বুঝি একটু ক্রুদ্ধ শোনাল।

'হয়তো তাই। কিন্তু আমার বাড়ির লোককে তা বুঝতে দেওয়া হয়নি। বুঝতে দেওয়া হয়েছে, তুমি আমার। সর্বসমেত আমার।'

'সর্বসমেত?' ভাস্করের চোখে এবার চোখে ফেলতে হল রুচিরাকে।

'হ্যাঁ, মাথার চুলের ডগা থেকে পায়ের নোখের কোণটুকু পর্যন্ত।' কণ্ঠস্বরে দৃঢ় হল ভাস্কর: 'শুধু আমাদের সংসারকে নয় জগৎ সংসারকে তাই বুঝতে দেওয়া হয়েছে। এখন, এই মুহূর্তে আমার

সংস্পর্শে এসে তুমি সমস্ত গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছ। তাই সবটাই মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'বাজে কথা।' পাশের দিকে আরো সঙ্কুচিত হল রুচিরা।

'কিন্তু যে দলিলটা দুইজনে যুক্ত হয়ে সই করে দিয়ে এলাম, যার একটা নকল পকেটে করে নিয়ে এসেছি সেটা বাজে নয়।' ভাস্কর দৃঢ়তর হল : 'আবার যতক্ষণ পর্যন্ত না নাকচ হচ্ছে ততক্ষণ ও ওর কাজ করে যাবে।'

একটু বুঝি ভয় পেল রুচিরা। দীর্ঘ চোখে তাকাল ভাস্করের দিকে। বললে, 'আপনার বাড়িতে গিয়ে আমাকে কী করতে হবে ?'

'শুধু একটু দাঁড়াতে হবে বউ হয়ে।' ভাস্করের গলায় কোত্থেকে আপনা-আপনিই মমতা এসে গেল : 'আঁচলটা একটু তুলে দিতে হবে মাথার উপর। এখন একেবারে কাঠ-কাঠ হয়ে আছ একটু লতা-লতা হয়ে দাঁড়াবে।'

আশ্চর্য, হাসল না রুচিরা। কাঠ-কাঠ থেকেই বললে, 'শুধু দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেই হবে?'

'তাই বলে নমস্কার, আসি, বলে দুটো হাত নাক বরাবর তুলেই পালাবে না, একটু বসবে।'

এখনো হাসল না রুচিরা। বললে, 'শুধু দাঁড়াব না, আবার বসব ?'

'মানে বউ-বরণ করতে কী সব স্ত্রী-আচার করে মেয়েরা তাই হয়তো করবে।'

সর্বাঙ্গে জ্বলে উঠল রুচিরা। 'তার মানে মুখে দই-মধু না গোবর পুরে দেবে আর কুলো দিয়ে ঠুকবে কপালটা ? অসম্ভব !'

'আচ্ছা, আমি ও সব না হয় বারণ করে দেব। কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কী ?'

'কিন্তু তোমার সিঁথিতে যদি কেউ সিঁদুর মাখিয়ে দেয় আপত্তি কিসের ?'

'সিঁদুর ?' এবার বুঝি নিজের ভাষাটা যথেষ্ট মনে হল না। অন্য ভাষার শরণ নিল রুচিরা, বললে, 'ইমপসিবল।'

'সাপের ছোবলের মত মনে হচ্ছে বুঝি সিঁদুরটাকে ?'

'তার চেয়েও বেশি। দেখুন কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। যা আমি বিশ্বাস করি না তা করতে পারব না কিছুতেই।'

'অনেক কিছু তো আমরা বিশ্বাস না করেও করি।'

'আপনি করুন গে। আমি করি না।'

'তুমিও করো। বিয়েতে বিশ্বাস না করেও বিয়ে করো।'

'থামুন। কিছুতেই পারব না পরতে।' রুচির কথা ছেড়ে দিয়ে যুক্তির কথা খুঁজে নিল রুচিরা ঃ 'সিঁদুর পরলে একজিমা হয়।'

'তেমনি মিষ্টি খেলে দাঁত যায়। শুপুরি খেলে ক্যানসার হয়। কিন্তু পান খেয়ে ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল করলে কেমন দেখায় বলো তো। তেমনি গায়ে গয়না, ভরাট মাথায় সিঁদুর, একেবারে রাণীর মত দেখাবে।'

'তারপর আবার গয়নাও পরতে হবে নাকি ?'. রুচিরার সারা শরীর রি-রি করে উঠল।

'হাতের কবজিতে সরু সুতোর মত ঘড়ি এও তো এক রকমের গয়না।' আবার অলক্ষ্যে কণ্ঠস্বরে স্নেহ এল ভাস্করের ঃ 'মা হয়তো তোমার জন্যে গলার হার আর হাতের চুড় গড়িয়েছেন, তাই দিয়ে সাজাবেন তোমাকে। আজকের দিনে এমন রিক্ত হাত আর শূন্য গলা কি ভালো দেখায় ?'

এই প্রথম সুযোগ এসেছে ভাস্করের, হাত বাড়িয়ে একটা করুণ, নিরীহ মণিবন্ধ টেনে নিল।

সবেগে তক্ষুনি হাত ছাড়িয়ে নিল রুচিরা। বললে, 'অমন সঙ সেজে পারব না দাঁড়াতে।'

'জীবনের সার্কাসে, কে জানে, আমরা সবাই সঙ। আর যাদের

আমরা সণ্ড ভাবি, কে জানে, হয় তো তারাই খাঁটি, তারাই সমস্ত খেলার বাহাদুর।'

'তারপর অমনি দাঁড়ালে ফ্ল্যাশ লাইটে ফোটো তুলে নেবেন আমার?'

'ও হো, সোমনাথকে বলে আসা হয়নি তো! ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। নিশ্চয়ই, একটি ছবি তুলে রাখতে হয়। একটা এভিডেন্স, চলে যাবার পর একটা স্মৃতিচিহ্ন। ড্রাইভারকে বলো, ফোটো-গ্রাফারের দোকান থেকে একজনকে তুলে নিয়ে যাই বাড়ি। জীবনের একটা মুহূর্তকে অবিনশ্বর করে রাখি।'

'ড্রাইভার।' খরখরে হুকুমি আওয়াজ বের করল রুচিরা: 'সোজা বাড়ি চলো।'

'ফোটো না হয় ছেড়ে দিই, কিন্তু আমাদের বাড়ি হয়ে চলো। ওঁরা সব পথ চেয়ে আছেন। গয়না বিশ্বাস না করেও সোনা নেওয়া যায়। সিঁদুর বিশ্বাস না করেও শুধু সাজা যায় সিঁদুরে। কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার। চলো। তোমাকে তো আর কেউ ধরে বেঁধে রাখবে না বাড়িতে। আমিই আবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

রুচিরা কথা কইল না।

ড্রাইভার সোজা চলল নিঃশব্দে, তার অর্থই নিজের বাড়ির দিকে।

ওদিক দিয়ে না ঘুরে এদিক দিয়ে গেলে আগেই ভাস্করদের বাড়ি পড়ে, ভাস্করদের বাড়ি হয়েই যাওয়া যায় সিধে। চূড়ান্ত মুহূর্তে ভাস্করের মনে হল ড্রাইভারকে হুকুম দেয়, গাড়িটা ওদিক দিয়ে নয়, এদিক দিয়ে ঢুকে পড়ো। কিন্তু গলায় সে জোর কই যে রুচিরার স্তব্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে? পকেটের দলিলে কি এত জোর আছে যে গাড়ি থামায়?

কিন্তু ছোট্ট একটা শব্দ সে বার করতে পারে মুখ দিয়ে।

'রোকো।'

গাড়িটা থামল। ভাস্কর বললে, 'আমি এইখানে নেমে যাই।' বলতে-বলতেই নেমে গেল। রুচিরার সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবে এ যেন রুচিরা না ভাবে।

রুচিরা চোখ তুলে তাকাল ভাস্করের দিকে। চোখের কালো দেখল না চোখের কোলে কালির পোঁচ দেখল ঠিক করতে পারল না। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার আগেই রুচিরা কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল। সংক্ষেপে বললে, 'আসবেন।'

তক্ষুনি-তক্ষুনি বাড়ি ফিরল না ভাস্কর। কী মুখে ফিরবে! বিয়ে বলে আপিস থেকে ছুটি নিয়েছে, যাওয়া যায় না আপিসে। হাঁটতে-হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে একটা ট্র্যামে উঠে বসল।

সন্ধে হয়ে গেল, তখনো ভাস্করের দেখা নেই। ভাবনায় পড়ল মহালয়া। কতক্ষণ অপেক্ষা করবে, নিমন্ত্রিতারা ফিরে গেল। বলে গেল রেজেস্ট্রি করা বিয়ে তো, একদিন না হয় তো আরেক দিন হবে। এর তো আর লগ্নালগ্ন নেই, এতে তো তার পাঁজিপুঁথি লাগে না।

মহালয়া সোমনাথকে পাঠালেন খোঁজ করতে। ব্যানার্জিদের বাড়িতে দেখে আয় তো ব্যাপার কী।

সোমনাথ গেল ভয়ে-ভয়ে। কোনো হৈ-চৈ নেই, লোকজন নেই, আলোও একটা বাড়তি জ্বলছে না কোথাও। বিয়ে বাড়ি কি এমনি নিঝুম হয়? এমনি কি তার ঝাপসা-ঝাপসা চেহারা থাকে? ওই তো বারান্দায় রুচিরাকে দেখা যাচ্ছে। দাদা কই? দাদা তো নেই ধারে-কাছে। মেয়েটাকে তো মোটেই বৌদি-বৌদি মনে হচ্ছে না। যদি তার বৌদিই হয় তবে তাকে অমনি দূরে, রাস্তায় ফেলে রাখতে পারে?

সাহস করে গেট খুলে বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ল সোমনাথ। হ্যাঁ, কর্তাই তো একা বসে আছেন ঘরের মধ্যে।

'আমার দাদা এখানে আছে?'

'কে দাদা ?' মুখ তুললেন জগৎপতি।

'ভাস্করনাথ—'

'সে কে ? সে এখানে আসবে কেন ?' নির্লিপ্তের মত নথিতে আবার চোখ রাখলেন জগৎপতি।

'তার কি আজ এ বাড়িতে বিয়ে হয়েছে ?'

'কী হয়েছে ?' বিরক্তিতে এবড়ো-খেবড়ো হয়েছে মুখ, জগৎপতি আবার তাকালেন !

'বিয়ে হয়েছে ? এ বাড়ির মেয়ের সঙ্গে ?'

'ফাট্ ! ভাগ ! এইটুকু ছেলে, এখুনি গাঁজা ধরেছে ! মিথ্যে বলার ওস্তাদ হয়ে উঠেছে !'

লোকটা পাগল নাকি ? কে জানে কী। আশ্চর্য নয়, মোটা একটা বই তুলে ছুঁড়ে মারতে পারে। পালিয়ে গেল সোমনাথ।

বাড়ি ফেরার মুখে দেখল দাদা আসছে। কী রকম মাঠ থেকে ফেরা হেরে-যাওয়া চেহারা।

বাড়িতে পা দিতেই মহালয়া সোমনাথকে দূরে রেখে ভাস্করকে নিয়ে পড়ল ঃ 'কী, হয়ে গিয়েছে বিয়ে ?'

পকেটে দলিলের নকলটা অনুভব করল ভাস্কর। বললে, 'হ্যাঁ, হয়ে গিয়েছে।'

সোমনাথ তো অবাক !

'তবে বউ এল না যে বড় ?'

'শরীর খারাপ।'

সোমনাথ তো আরো অবাক।

দিদি বৌদি মাসিমারা যে চলে গিয়েছে তা আর জিগগেস করতে হয় না। ভাস্কর আপোসের সুরে বললে, 'তাতে কী। অন্য একদিন আসবে। সেদিন তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।'

'আহা, এ আবার কোন ঢং !' এতক্ষণ প্রতীক্ষা করে থাকার পর

এই হতাশা মহালয়াকে অস্থির করে তুলল। 'আপিসে যেতে পারল, তখন শরীর বেশ সুস্থ, আর এখানে এসে একটু দেখা দিতেই ভেঙে পড়ল শরীর! এ সব ন্যাকামির কথা।'

'একটু লজ্জাও তো হতে পারে!' কেন কে জানে তবু রুচিরারই পক্ষ নিতে অলক্ষ্যে কে ঠেলছে ভাস্করকে।

'আহা, লজ্জা আবার কী। বাপের বাড়িতে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে না, বেরুচ্ছে না আত্মীয়স্বজনদের সামনে? এ তো স্বাভাবিক স্ত্রী—লজ্জা কিসের?

'তবু—'

'রাখ, বুঝতে পেরেছি, এ অন্য রকমের লজ্জা। এখন বোধহয় পস্টাপস্টি বুঝতে পেরেছে আমারা খুব গরিব, আমাদের ঘর-দোর ভীষণ ছোট, আমাদের জিনিসপত্র একেবারেই নেই, তাই, তাই, তাই ওর এই হেনস্তা। তাই ও এল না—'

'বা, গরিব হলে কী হয়?' জগৎপতি বোঝাচ্ছেন তাঁর মেজ শালা, সরোজেন্দ্রকে: 'গরিব হলে ছেলে কি আর ভালো হতে পারে না?' জগৎপতি বেদিতে বসা আচার্যের ভঙ্গিতে বললেন, 'গুচ্ছের টাকা থাকলেই কি গুচ্ছের সুখ হয়? হোক গরিব, তবু স্বামী যদি সৎ হয় চারত্রবান হয়, কী বলে, যদি পত্নীপ্রেমিক হয়, তাহলে মেয়ের সুখশান্তি বিশেষ কম হয় না।'

'তা না হোক,' সরোজেন্দ্র বললে, 'কিন্তু তাই বলে জগৎপতির মেয়ের, একমাত্র মেয়ের একটা চালচুলোহীন কেরানির সঙ্গে বিয়ে হবে এ ভাবা যায় না।'

'তা তুমি কী করতে পারো?' সরলতামাখা শিশুর মত মুখ করল জগৎপতি: 'যদি ভালোবাসা হয় তা হলে তোমার কী করবার আছে? তুমি আধুনিক ভাবাপন্ন শিক্ষিত বাপ হয়ে তাকে বাধা দিতে পারো না। আমিও তাই দিইনি বাধা।'

'আর বাধা দিতে গেলেই বিপরীত কাণ্ড।' সমাজের কত বড় দুর্দিন তারই দুশ্চিন্তায় পীড়িত সরোজেন্দ্রঃ 'হয় আত্মহত্যা নয় কেলেঙ্কারি।'

বড়লোক হবার পর ভায়েদের সঙ্গে সম্পর্কে ছেড়েছে, কবেই ছেড়েছে, কে কোথায় আছে খবর রাখে না, কার কে বা কটা ছেলে-পিলে তাও সব ভাসা-ভাসা—কিন্তু শালাদের ছাড়তে পারেনি, শালাদের কেউ ছাড়াতে পারে না। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই তারাই আজকাল আপন জন।

'বাধা দিতে যাবই বা কেন?' আলোচনার খেই ধরল জগৎপতিঃ 'একের স্বাধীনতা তো অন্যের মাপ অনুসারে চলবে না। আমার পছন্দই তো আর তোমার পছন্দ নয়। তাই আমি বললুম তুমি যাকে ভালো বুঝেছ প্রিয় বুঝেছ তাকেই তুমি বিয়ে করো। স্বাধীনতা তোমার, দায়িত্বও তোমার। কী বলো, ঠিক বলিনি? ঠিক করিনি?'

দরাজ গলায় সায় দিল সরোজেন্দ্রঃ 'একশোবার ঠিক।'

'তা ছাড়া এখনো আমরা জাতিভেদ মানব, স্বাধীন হবার পরেও, এ অসহ্য।'

এখন তো আর বামুন-কায়তের জাতিভেদ নেই, সে তো প্রায় উঠে গেছে, এখন বড়লোক আর গরিবের জাতিভেদ।'

'সে জাতিভেদও আমরা উঠিয়ে দেব। বলো দিইনি উঠিয়ে? গরিব বলে ভাস্করকে জামাই করতে আপত্তি করেছি? এই তো বিয়েটা আজ হয়ে গেল। প্রেমের সম্মান তো আমি রাখলুম। তারপরে ওদের বনিবনা না হয়, কোনো বিরোধ-সংঘর্ষ বাধে, বিয়ে ওরা উচ্ছেদ করে দেয়, তা আমার কী করবার আছে? তাতে আমার কী দায়িত্ব!' জগৎপতি ক্লান্তের মত পিঠ রাখলেন চেয়ারে।

'সে পরের কথা পরে। সে ওদের নিজেদের আর্টিস্ট্রি, নিজেদের কারিগরি।' বললে সরোজেন্দ্র।

'সে ওদের নিজেদের অদৃষ্ট।'

একটু চুপচাপ থাকলেন জগৎপতি। পরে দীর্ঘ নিশ্বাসটা চাপা দিয়ে বললেন ব্যস্ত স্বরেঃ 'তোমার বোনই একটু আপসেট। শত হলেও প্রেম-ট্রেম কিছু বোঝেন না, করেনও নি কোনোদিন। তাঁকে একটু বোঝাও।'

সরোজেন্দ্র উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বললে, 'আর রুচি?'

'তার তো কেল্লা ফতে। সে নিজের সৌভাগ্যে ডগমগ।'

ঘরে এতক্ষণ টেবল-ল্যাম্পটা জ্বলছিল, সরোজেন্দ্র চলে গেলে বোতাম টিপে আলোটা নিবিয়ে দিলেন জগৎপতি। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হল যেন শুভময় এসে দাঁড়িয়েছে। হাসতে-হাসতে বলছে, কী হত বিয়েটা হতে দিলে? কী হত যদি সত্যি মেয়েটাকে সুখী হতে দিতেন, হালকা হতে দিতেন? সৌভাগ্যেই ডগমগ বৈকি। কী লাভ হল ওর সৌভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভুয়ো সম্মানকে তৌল করতে গিয়ে? পারলেন আমাকে সম্পূর্ণ তাড়াতে? না, কি ভাস্করকেই পারবেন?

যেন কয়েক পা এগিয়ে এল শুভময়। কী রকম শীর্ণ ও শুকনো দেখাচ্ছে। ছন্নছাড়া, ভবঘুরে।

না, কিছু হয়নি আমার। টাকা যখন বন্ধ করে দিলেন, বুঝতে পেরেছি, আমার আপিস আর কেউ নয়, আপনারই ষড়যন্ত্রের সহায়, তখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। প্রথমটা ঘোরতর কষ্টে কেটেছে। কিন্তু হাতে-পায়ে ঘাড়ে-পিঠে খাটতে তো আমরা পিছ-পা নই। তাই যা হোক দাঁড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু ভাবছি, আপনি কী করবেন? আপনার ভাগ্য যখন আপনাকে কায়িক শ্রমে ডাক দেবে?

না, আমার ঠিকানা নেই। আমি কি এক জায়গায় আছি? জীবিকার ঠেলায় ঘুরছি এখানে-ওখানে। যাকে শেষ করে দিতে

চেয়েছিলেন, উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাকে আর খুঁজবেন কোথায়? ডাকলেই কি সে আর আসে?

তার যে-ডাক মনের মধ্যে আছে তা আছে। সে ঠিক সময়ে এসে হাজির হবে। তাকে বেঁচে থাকতে দিন। উজ্জ্বল হতে দিন। বেঁচে থাকাই উজ্জ্বল হওয়া।

তত দিনে ভাস্করকে তাড়ান। পথ পরিষ্কার রাখুন।

আরো এক পা এগিয়ে এল বুঝি সেই ছায়ামূর্তি। জগৎপতি বোতাম টিপে আবার আলো জ্বাললেন। রগ দুটো টিপে ধরলেন দু হাতে। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে। অসহ্য যন্ত্রণা।

অসহ্য যন্ত্রণা ভাস্করেরও। পাচ্ছে না ঘুমোতে। বিছানা এত কাঁটায় আকীর্ণ ছিল এর আগে কোনো দিন আবিষ্কার করেনি।

মনকে প্রবোধ দিতে চাইল। তোমার অধিকে কেন লোভ? যা পেয়েছ তাই তোমার যথেষ্ট। আজকালকার দিনে কে হুট করে দুশো টাকা প্রমোশন পায়? একটা দলিলে সামান্য সই করার দাম পাঁচ হাজার আদায় করে? আরো পাঁচ হাজার নাচছে তোমার কপালে। তাই নিয়ে তৃপ্ত থাকো। পাশ ফের। ঘুমোও। তোমার কিছুই হয়নি না-ঘুমোবার। তাঁতি আছ, ঠিক খাচ্ছ তাঁত বুনে। কেত্তন ধরে কী লাভ?

আর সোমনাথ ভাবছে, বউ নেই এ কেমনতরো বিয়ে? বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ কেমনতরো অসুখ? আর মেয়ের বিয়ে দিয়ে লোকটা বিয়ের নামে বলে কিনা, ফাট? আর আমাকে বলে কিনা, গাঁজা খেয়েছি।

আর দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে মহালয়া জপ করছে। আর ভাবছে গোপালকে। বলছে, গোপাল, তুমি কি সত্যিই এসেছ? সত্যিই আসবে?

'বউমা কেমন আছেন একবারটি খোঁজ নিবি না ?'

মহালয়াই খালি ট্যাক-ট্যাক করে। আপিসে বেরুবার সময় মন্ত্র ধরিয়ে দেয়। হাতে ঘড়ি বাঁধতে-বাঁধতে ভাস্কর বলে, 'কে কার খোঁজ করে তার ঠিক নেই।'

আপিস থেকে ফিরলে মহালয়া ·আবার মনে করিয়ে দেয়ঃ 'কি রে, গিয়েছিলি ?'

'সময় পাইনি।' পাশ কাটিয়ে যায় ভাস্কর।

এ কী রকম হল ? বিয়ে হতে না হতেই বেসুরো ! কারু প্রতি কারু টান নেই। এই তো কাছাকাছি বাড়ি। তুই বউ, তুইও তো আসতে পারিস নিজের থেকে। মিলিটারি-ঠেঙানো মেয়ে, তোরই বা কী এত সঙ্কোচে নুয়ে থাকা ! একদিন শুধু একটু নিজের সংসারে দেখা দিয়ে যেতে পারিস না ? আর তুই স্বামী, তোকেও আমি প্রশংসা করতে পারি না। তোর কোনোই জোর নেই ? গায়ের জোর ? ব্যক্তিত্বের জোব ?

কী জানি কী ! অনিয়মে সবই ব্যতিক্রম। মহালয়া ঠাকুর-ঘরে গিয়ে বসে। ভাবে, আর সব থাক-যাক, তাব গোপাল ঠিক আছে।

'আজ একবার সময় পেলে খোঁজ করিস।' আবার মন্ত্র দেয় মহালয়া।

'ও সব ভুলে যাও।' হাতে ঘড়ি বাঁধাতে-বাঁধতে ভাস্কর বলে, 'ভদ্রগোছের একটা চাকরি হয়েছে, ব্যাঙ্কে য়্যাকাউন্ট হয়েছে, এই নিয়েই খুশি আছি। আর সব স্বপ্নকথা !'

'বা, তা কী করে হয় ?'

হয়। তাই তো ছিল। আপিস যেত-আসত, তার বাইরে

ফাঁকা মাঠ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এখনই বা বেশি আর কী হয়েছে! একটু ছুঁতে গিয়েছিল, হাতটা সরিয়ে নিয়েছে। আর সেই যে বলেছিল, 'আসবেন', ওটা হচ্ছে, টোপ, যাতে ভাস্কর একেবারে না বিগড়ে যায়। সেই ডাক মানে অর্থীর মত এস, আরো কিছু তোমার সাংসারিক সুরাহা হয় কিনা। দাবিদার হয়ে এস না।

'তুই স্বামী, তুই তোর দাবি ছাড়বি কেন?' মহালয়াই আবার খোঁচা মারে।

সত্যিই তো, হঠাৎ মাথা ঘুরে যায় ভাস্করের, বাপের বাড়িতে থাকবে বললেই সে থাকবে বাপের বাড়ি? ধর্মে নীতিতে আইনে কোথাও এর সমর্থন নেই। দলিল যতদিন জীবিত আছে ততদিন তার স্বামীত্বও জীবিত। আর যতদিন স্বামীত্ব জীবিত ততদিন স্ত্রী বাধ্য স্বামীর সঙ্গে একত্রবাসে। হ্যাঁ, বাধ্য। বেশি তড়পিও [illegible] আদালতে স্ত্রী-দখলের মামলা করে দেব।

তা ছাড়া, পরে যে রুচিরাকে ডিভোর্স করে দিতে হবে, তারই জন্যে একটা বিরোধের ভূমিকা দরকার। মাকে তখন বলা যাবে এমন দুর্বিনীত ঝগড়াটে অসাধ্য স্ত্রীকে নিয়ে কে ঘর করবে? দিই এটার দড়ি খুলে। যেখানে খুশি চরে বেড়াক। যেখানে খুশি বাঁধা পড়ুক।

অবস্থা তখন এমন চরমে এনে দেবে, মা-ই বলবেন, দে ওটাকে তাড়িয়ে। তা হলেই নিখুঁত হবে।

একটা বছর কি কম? একটা দিন কি কম? একটা মিনিট পেলে তাতেই রাজ্য জয় করা যায়। ঘুরে আসা যায় পৃথিবী।

জুনিয়র রয় এসেছে, খোলা কাচারির প্রথম দিনেই সেই ডাক্তারের আপিল, মুহুরি ব্রিফ এগিয়ে দিল।

'এ কনভিকশান টিকতে পারে না।' ব্রিফ ওলটাতে ওলটাতে বললেন জগৎপতি: 'মেয়েটার জীবন বিপন্ন হয়েছিল বলেই সে

ছুরি চালিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মেয়েটা তো বেঁচে গিয়েছে, বাঁচিয়ে দিয়েছে ডাক্তার। একটা সুস্থ-সমর্থ আস্ত মানুষের থেকে একটা আগন্তুক প্রাণের দাম বেশি?'

জুনিয়র বললে, 'প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই মেয়েটার জীবন বিপন্ন হয়েছিল কিনা।'

'মেডিক্যাল এভিডেন্স থেকে সেটা দেখানো যাবে। য়্যাপার্ট ফ্রম ইট, অন্যতর অর্থেও এ ব্যাপারটা দেখা হবে না কেন?' হাতের লাল-নীল পেন্সিলটা শূন্যে স্থির রেখে বললেন জগৎপতি, 'মেয়েটার জীবন বিপন্ন—ধরো সামাজিক কলঙ্ক থেকে, আত্মগ্লানি থেকে—সেইটেই বা কি কিছু কম শত্রু? সেই শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে ডাক্তার যদি মেয়েটাকে জীবনের সুস্থ লাবণ্যে দাঁড় করিয়ে দেয়, তা হলে কি সে সমাজের হিত করে, না অহিত করে?'

'এই লাইটে কোনো কেস আর্গ্যুড হয়নি কোর্টে।'

'না, না, কোর্টের কথা ছেড়ে দাও। আমি সমাজের দিক থেকে বলছি। শত্রুকে ঠেকাবার জন্যে তুমি নানা রকম কনট্রোলের বেড়া দিয়েছ, বসিয়েছ সশস্ত্র প্রহরী, খুব ভালো কথা, কিন্তু আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় একটা শত্রু যদি সমস্ত বেড়া-পাহারা টপকে ঢুকে পড়ে, তাকে তখন আর মারা যাবে না, তাকে তখন স্বাগত জানাতে হবে এ অভিনব।'

জুনিয়র বললে, 'এরা বলবে দুর্ঘটনা ঘটবে কেন?'

'দুর্ঘটনা তো ঘটবার জন্যেই, আর দুর্ঘটনা ঘটবে না কেন? চারদিকে দারিদ্র্য বেকারি হতাশা অনিয়ম, তার মধ্যে উত্তেজিত জীবন, ক্ষিপ্র আর ক্ষিপ্তের জনতা, দুর্ঘটনা ঘটাই তো স্বাভাবিক। তারপর তুমি সমাজ, তুমি নিজেই প্রলুব্ধ [illegible] বিজ্ঞাপন দিয়ে ফিরছ। যে সমস্ত উপায়-পদ্ধতি আগে বে[illegible]ছিল, তাই এখন তুমি তাদের হাতের কাছে, এমন কি মুখের কাছে এনে দিচ্ছ।

বড়-বড় অক্ষরে জয়গান গাইছ। সেই ক্ষেত্রে এদিক-ওদিক দু-একটা ফসকে যাবেই। বন্দুকের গুলি পর্যন্ত ফসকায়, আর ও তো সামান্য কথা।' প্রায় আর্গুমেন্টের পর্যায়ে নিয়ে এলেন জগৎপতি: 'তারপর তা মেরামত করতে গেলেই ধরছ ডাক্তারকে। তোমাদেরই ব্যবস্থার বলি সেই অসহায় মেয়েটাকে। কী হচ্ছে অন্যত্র? এই দেশে অচল তো ওই দেশে সচল। মেয়েটার সঙ্গতি নেই, তাই এ দেশ থেকে প্লাই করে ও দেশে চলে যেতে পারল না, বিজয়িনীর মত পারল না জীবনকে সম্বর্ধনা করতে। পুলিশের আসামী হয়ে দাঁড়াল কাঠগড়ায়।'

বিনীত মুখে রয় বললে, 'অন্যদিকেও বলবার আছে।'

যা জগৎপতির ধারা, টেবলে ঘুসি মারলেন: 'কিছু বলবার নেই। চোরকে চুরি করতে পাঠিয়ে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলা ভণ্ডামি—স্রেফ ভণ্ডামি। তুমি যদি চুরিকে লিগ্যাল করো, চোরাই মাল মারাকেও লিগ্যাল করতে হবে।'

মুহুরি হাসল কিন্তু জুনিয়র হেসেও হাসল না। বললে, 'তা হলে পাপ বেড়ে যাবে সমাজে।'

'আর এই যে মানুষ বাড়ছে, এ সব মূর্তিমান পাপ নয়?'

কে একটা লোক বৈঠকখানার পাশের প্যাসেজ দিয়ে দ্রুত পায়ে অন্দরমহলে ঢুকে গেল।

ঠিক লক্ষ্য করেছেন জগৎপতি: 'কে?'

লোকটা প্রায় সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁচেছে। বললে, 'আমি।'

'কে আমি?'

সিঁড়ি দিয়ে উঠছে সেই স্বরটা: 'আমি ভাস্কর।'

একটু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না। একবিন্দু দ্বিধা নেই। যেন আলো-হাওয়ার মত সরল। আলো-হাওয়ার মতই অধিকারে অবাধ।

চুপ করে গেলেন জগৎপতি। নথিতে মন দিলেন।

সরাসরি একেবারে ঢুকতে পারল না এবার, কেননা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল ঘরে রুচিরা নেই। কিন্তু ঘরে যখন রেডিও চলছে তখন সন্দেহ নেই, সাময়িক অনুপস্থিতির পর এখুনি ফিরে আসবে। ভাস্কর নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল, বসল চেয়ারে।

ঠিক। খানিক পরেই পাশের ঘর থেকে এল রুচিরা। এক মুহূর্ত বুঝি বোঝেনি ঘরে কেউ আছে, এসে বসে আছে, তাই একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল; কিন্তু ক্ষণকালেই ঘরের হাওয়াটা আর কারু নিশ্বাসে অন্যরকম হয়েছে টের পেতেই পিছন ফিরল, বিরক্ত বিমর্ষ মুখে বললে, 'এ কী! আপনি কখন?'

'এই তো।'

'একেবারে না বলে কয়ে?'

'কেন, আসা যায় না নাকি?'

'এসেছেন তো দেখতেই পাচ্ছি। তবু একটু জানান দিয়ে এলেই হয়তো শোভন হয়।'

'শোভনের কথা আর না-ই বললেন।' কিছুতেই আর এখন 'তুমি' বলতে পারল না ভাস্কর: 'কিন্তু জানান যে দেব ঘরে লোক ছিল?'

'লোক না ছিল তো পর্দা ছিল।'

'পর্দা থাকলে কী হয়?' এত দুঃখেও হাসি পেল ভাস্করের।

'পর্দা থাকলে বাইরে দাঁড়াতে হয়। ভিতরের লোক যতক্ষণ না সঙ্কেত করে ততক্ষণ।'

'ভিতরে লোকই নেই তো সঙ্কেত করবে কী! আর ভিতরের লোকের জন্যে হাঁ করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার দিন আর আমার আর নেই।'

'কেন, আপনার কিসের দিন?'

'এই যেমন এসেছি, সরাসরি চলে আসার দিন। ঘোষণা না করেই ঘরে ঢোকার দিন।'

'ঐ একটা কাগজের জোরে ?'

'তা ছাড়া আবার কী। সমস্তই কাগজ। আবার আপনি যখন ছাড়া পাবেন, আমাকে কলা দেখাবেন, তখনও সেই কাগজেরই জোরে।' তরল হবার চেষ্টায় ভাস্কর হাসল : 'আপনার টাকা ও কাগজ, মান-সম্ভ্রম ডিপ্লোমা-সার্টিফিকেটও কাগজ, বাড়ি-ঘরের স্বত্ব-স্বামিত্বও কাগজ। দয়া করে রেডিওটা বন্ধ করে দিন। কাজের কথাটা সেরে নি।'

'কাজের কথা কিছুই নেই।' গর্বের ভঙ্গি ফোটাল রুচিরা।

'কাজ বাগিয়ে নিয়ে এখন এ কথা বলা সোজা।' ভাস্কর নিজে উঠেই রেডিওটা বন্ধ করে দিল। বললে, 'কিন্তু নাটক এখনো শেষ হয়নি। সুতরাং কাজের কথা এখনো কিছু থেকে গেছে।'

'না, নেই। এক দফায় টাকা নিয়েছেন, কাজ দিয়েছেন, আরেক দফায় নেবেন, বাকি কাজটুকু সেরে দেবেন।'

'অত সোজা নয়। যা বলছি শুনুন। মিছিমিছি ঝগড়া করে লাভ নেই।' ভাস্কর আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল। বললে, 'ঐ সোফাটাতে বসুন।'

সমস্ত অসহ্য লাগছে রুচিরার। ঝিলিক দিয়ে উঠল : 'আপনার কথামত বসব ?'

'আমার কথামত বসবেন কেন ? এমনিতেই বসবেন। একটা লোক কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ? তার উপর আপনি অসুস্থ। বসলে পরেই আপনি আরাম পাবেন।'

'কত আপনি আমার আরাম দেখছেন !'

কথায় কী রকম একটু টান লাগল না ? উৎসুক হয়ে তাকাল ভাস্কর। না, এদিকে চোখ নেই রুচিরার। জানলার শিক ধরে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

'আপনার আরাম দেখছি না ? সমস্তই তো আপনার আরামের

জন্যে। বলুন, এদিকে তাকান, বলুন, আপনি এখন প্রচণ্ড আরাম পাচ্ছেন না? আপনার সমস্ত ভার লঘু হয়ে যায়নি? এত বড় একটা উপকার করলাম তবু আপনার সামান্য কৃতজ্ঞতা নেই?'

'বলুন কী আপনার কথা।' রুচিরা ঘুরে দাঁড়াল। সোফায় বসল মুখোমুখি।

'এখন আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে।'

মুখ-চোখ আবার গম্ভীর করল রুচিরা। বললে, 'কী কাজের কথা আছে তাই বলুন।'

'কথাটা খুব ছোট।'

'তবে এত ধানাই-পানাই করছেন কেন? আপনার আপিস নেই?'

'না। অসম্বন্ধ কথা কিছু বলব বলেই ছুটির দিন বেছে এসেছি। আপনার বাবাকেও দেখলাম বাড়িতে আছেন, নিচে বসে কাজ করছেন।'

'বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না। দেখলাম তিনি কাজ করছেন তাই আর তাঁকে বিরক্ত করলাম না।'

'তিনি দেখেছেন আপনাকে?'

'বোধহয় দেখেছেন। না দেখলেও বুঝেছেন আমি এসেছি।'

'বুঝেছেন, তবু তিনি আপনাকে আটকালেন না?' ভুরুতে বিস্ময় আঁকল রুচিরা।

'আটকাবেন কেন? তিনি আইনজ্ঞ, বিচক্ষণ, তিনি জানেন আমার ন্যায্য অধিকার হয়েছে বাড়িতে ঢোকবার, আপনার কাছাকাছি হবার। এমন কি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেবার। তাই জায়গা ছেড়ে ওঠেননি, ছোট কড়ে আঙুলটাও নাড়েননি। আপনার বাবার ব্যবহার থেকেই অবস্থাটা বুঝে নিন। আচ্ছা, আপনার মা কোথায়?'

'কেন, আবার মাকে কেন ?' ধমকে উঠল রুচিরা।

'আপনার মা আমার আসার খবর পেলে নিশ্চয়ই, আর কিছু না হোক, একথালা জলখাবার পাঠাতেন।'

'জলখাবার ?'

'বা, জামাই এলে শাশুড়ি জলখাবার খাওয়ায় না ?'

মুখ চোখ করুণ করল রুচিরা। ম্লান কণ্ঠে বললে, 'মার খুব অসুখ।'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'হাই ব্লাডপ্রেসার। খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল।'

'সব আপনার কাণ্ডে ?'

'না, আপনার ভয়ে।'

'আমার ভয়ে ? সে কি, আমাকে ভয় কিসের ? আমি কী করেছি ?'

'মার ভয় হয়েছিল আপনি কথা রাখবেন না।'

'কথা রাখব না মানে বিয়ে করব না ?'

'হ্যাঁ, ভেবেছিলেন, টাকা নিয়ে সরে পড়বেন।'

'এ রকম ধারণা হবার কারণ ?'

'যারা গরিব, যারা অভাবী, যারা ছোট-ছোট লুব্ধতায় দিন-রাত ঘুরে বেড়ায় তারা কথা রাখে না, তারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধ করে সরে পড়ে।'

'বটে ? আর আপনার নিজের ধারণা ?'

'আমিও মার সঙ্গে একমত।'

'গরিবেরা কথা রাখে না ?'

'না, কথার চাইতে তাদের কাছে তদের নিজের সুবিধের দাম বেশি। স্বার্থের জন্যে তারা অনায়াসে সত্যকে ছেড়ে দেয়। এমন ছেড়ে দেয় যে, তাদের আর পাত্তাই পাওয়া যায় না যে প্রতিশ্রুতিটি তাদের কেউ মনে করিয়ে দেবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দায়ে শুধু গরিব কেন, বড়-লোকেরাও কিছু কম পড়ে না। যাক গে', ঝগড়ার সুরটা জোর করেই তাড়িয়ে দিল ভাস্কর। বললে, 'এখন কেমন আছেন ?'

'কিছুটা ভালো। তবে এখনো নিচে নামেন না।'

'কবে থেকে ভালো ? যেদিন বিয়েটা হয়েছে সেদিন থেকে ?'

'হ্যাঁ, বলতে পারেন, যেদিন সেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের আপিসে একটা ছাপানো ফর্ম সই করা হয়েছে।'

'অতখানি কথার আশ্রয় না নিয়ে সভ্য ভাষায় সংক্ষেপে সেটাকে বিয়ে বলে। যাক গে। আপনার মার যখন অসুখ তখন আপনাকেই অতিথি সৎকার করতে হয়।'

রুচিরা দৃঢ় হল। বললে, 'আপনার কথাটা কী এই বেলা সারুন। সভ্য ভাষায় সংক্ষেপে সারতে তো আপনি বিশেষ দক্ষ।'

'তাই বলে আমাকে আপনি এক কাপ চা-ও খেতে দেবেন না ?'

'ও সবের ভার আমার উপরে নেই।'

'না থাক। তাই বলে আপনি বললে আপনার অন্তরঙ্গ পুরুষ এ বাড়িতে এক পেয়ালা চা পাবে না এ অসম্ভব।'

'কী বললেন ?'

'আপনার আগন্তুক অতিথি।'

'আমি বললে এ বাড়ির যে-কাউকে চা খাওয়াতে পারি কিন্তু তার একটা টাইম আছে।'

'জামাইয়ের জন্যেও টাইম ?'

'আপনার কথাটা সারুন।'

'কথাটা আরো ছোট্ট। সেটা আর কিছুই নয়, আমার একটা অনুরোধ রাখুন। উঠুন, চলুন আমার সঙ্গে। আচ্ছা, এই বেলা না হয় বিকেলে চলুন।'

'কোথায় ?'

'কথাটা আরো ছোট্ট। সেটা আর কোথাও নয়, আমাদের বাড়ি।'

'আমাদের—আমাদের বাড়ি মানে?'

'মানে আমার বাড়ি। আর যেটা আমার বাড়ি সেটা আপনারও বাড়ি। চলুন।'

'ইমপসিবল।' রুচিরা সেই বিশ্রী ইংরিজি কথাটা উচ্চারণ করল।

'আমার মা, আপনাকে, তাঁর ছেলের বউকে, দেখতে উৎসুক।'

'আমি যাব না। পারব না যেতে। যদি আপনার মার ইচ্ছে হয় তিনি এখানে এসে আমাকে দেখে যেতে পারেন।'

ভাস্করের সমস্ত স্নায়ু-শিরা কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল, দংশনের তীক্ষ্ণ উত্তপ্তিতে। তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করল, রূঢ় হতে দিল না। বললে, 'ছেলের বিয়ের পর মা প্রথম বউ দেখতে আসে ছেলের শ্বাশুড়বাড়িতে এমন অদ্ভুত কথা কেউ শোনেনি।'

'বউ যদি অসুস্থ হয় আসতে দোষ কী।'

'আপনি তো তেমন কিছু অসুস্থ নন।' চোখে আবার হঠাৎ স্নিগ্ধতা এল ভাস্করের: 'আপনি অনায়াসে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। তাঁর তখন কত আনন্দ হবে।'

'কিন্তু সেই আনন্দ কত দিন!'

'পরের কথা পরে। বহু আনন্দই সূচনায় অকপট থেকে পরে মিথ্যে হয়ে যায়। তার জন্যে আজকের আনন্দকে কে প্রত্যাখ্যান করে? হাতের পাখিকে কে উড়িয়ে দেয়? শুনুন, আমার এ সামান্য অনুরোধটুকু রাখুন। সমস্ত পাহাড়-পর্বত এড়িয়ে কাকে আমি নির্বাচন করেছি, কাকে আমি ভালোবেসেছি, মাকে একবার দেখাতে দিন।'

'ভালোবেসেছেন?'

'ঐ অমনি করে বলা। অন্তত মা তো জানেন ঐ রকম। তা ছাড়া ভালোবাসলেই ভালোবাসা। শুনুন,' চেয়ারের পিঠ ছেড়ে

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ভাস্কর। বললে, 'আমার মার কাছে, আগেই আপনাকে বলেছি, আপনার লেশমাত্র সংকোচ নেই। আপনি তাঁর কাছে শুধু স্বাগত নন, আপনি সম্মানিত।'

'সম্মানিত?'

'হ্যাঁ, তাঁর কাছে আপনি শুধু তার পুত্রবধূ নন, তাঁর গোপালের মা।'

'গোপালের মা?' হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না রুচিরা। প্রায় আর্তনাদের মত শব্দ করে উঠল: 'ইমপসিবল! তারপর যখন সত্য টের পাবেন?'

'সত্য? সত্য আর কোথায়? এখন আইন যা বলবে তাই সত্য। এক বিশাল অশ্বত্থ গাছের মত আমি পক্ষী আর তার শাবক দুইকেই আচ্ছাদন করেছি। সুতরাং আমিই সত্য, 'তাহার উপরে নাই'। আর আপনি যাকে সত্য বলছেন, ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক সত্য, তাও যদি একদিন মার কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়, মার কাছে যে একবার গোপাল সে সব সময়েই গোপাল। সব শিশুই গোপাল।'

'সব শিশুই গোপাল?'

'হ্যাঁ, শিশুর আবার জাতিভেদ কোথায়?' উৎফুল্ল চোখে বলতে লাগল ভাস্কর: 'একটা প্রকাণ্ড টেবিলের উপর আট-দশটা উলঙ্গ শিশুকে পাশাপাশি শুইয়ে দিন না—দেখবেন সব কটা সমান হাসছে ফ্যাক ফ্যাক করে। বলে দিতে পারবেন, কোন ছেলেটা ফুটপাতে হয়েছে, কোনটা বস্তিতে, কোনটা রাজপ্রাসাদে? তফাত করতে পারবেন না। সব শিশুই সমান। সব শিশুই গোপাল।'

তির্যক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রুচিরা। বললে, 'আমি আপনাদের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বুঝেছি। এমনি করে আমাকে আপনারা আপনাদের সংসারের খাঁচায় বন্ধ করে রাখতে চান। রাখতে চান গরিব করে, সংকীর্ণ করে। গরিবের প্রতি আর আমার মোহ নেই। যেখানে

আনন্দ নেই আকর্ষণ নেই সে ঘরে আমাকে ডাকবেন না। আমাকে আমার ছুটি দিন।' দুহাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত কেঁদে উঠল রুচিরা: 'আপনাকে শুধু মুক্তিদাতা বলে ডাকা হয়েছে, আমাকে শুধু মুক্তি দিয়ে আপনি মুক্ত হোন। কেন মুক্তির বেশি আপনি দিতে চাচ্ছেন, নিতে চাচ্ছেন? না, না, পারব না, কিছুতেই যেতে পারব না।'

'আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝছেন, ভুল দেখছেন।' শান্তস্বরে ভাস্কর বললে, 'মুক্তির ফটকে পৌঁছুতে হলে খানিকটা পথ তো হাঁটতে হবে। আমরা তো সেই পথে সেই ফটকের দিকেই চলেছি। পথ দিয়ে যেতে-যেতে শুধু এদিক-ওদিক একটু তাকিয়ে যাওয়া—'

'যাতে শেষ পর্যন্ত ফটকে গিয়ে না পৌঁছুই।' করতলের ঢাকা থেকে মুখ মুক্ত করল রুচিরা। 'মাপ করবেন, যা মিথ্যে তাকে ছলনা দিয়ে আর চাইনে জীবন্ত করতে।'

চাইনে, চাইনে—সমস্ত ঘরদেয়াল ভিতর-বার-আলো-হাওয়া বলে উঠল সমস্বরে।

চোখের কোলে এখনো জল টলটল করছে, উপর পাতার পালকে এখনো কণাকণা শিশির—এক পলক দেখল ভাস্কর। যে এমনিতে গর্বে-গরিমায় সুন্দর সে বুঝি কাঁদলেও সুন্দর। কিন্তু কতক্ষণ তুমি দেখবে? যার প্রতি টান নেই আকর্ষণ নেই, আনন্দের সম্বোধন নেই, তাকে দেখাবেই বা কতক্ষণ। নির্মম আঁচলে চোখ মুছে ফেলল রুচিরা।

'বেশ, তবে তাই, যাবেন না।' উঠে পড়ল ভাস্কর।

বারান্দায় কার আসার শব্দে দুজনেই উচ্চকিত হল।

'এ কী, মা, তুমি উঠে এসেছ কেন?' রুচিরা এগিয়ে গিয়ে ধরল এণাক্ষীকে। আস্তে-আস্তে ডিভানে বসিয়ে দিল। পিঠের দিকে কটা বালিশ দিল এগিয়ে।

'কী হয়েছে? কী চায় ও?' সামনেই দাঁড়ানো ভাস্কর, তাকে উপেক্ষা করে এণাক্ষী রুচিরাকেই জিগগেস করলে।

রুচিরা তাকাল ভাস্করের দিকে। ভাস্কর বললে, ‘ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছিলাম।’

‘এমন কোনো কথা ছিল ?’ এবারও রুচিরার দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল এণাক্ষী।

‘না।’ স্পষ্টস্বরে রুচিরাই উত্তর দিল।

‘তবে ?’ এণাক্ষী এবার ভাস্করকে লক্ষ্য করল।

‘সর্তগুলি তো আর লেখা হয়নি যে নির্দিষ্ট করা যাবে।’ ভাস্কর বললে, ‘তবে সব কথাই তো উচ্চারিত হয় না, কিছু কথা আবার উহ্য থাকে। খেতে আসবেন, এ বলে কেউ নেমন্তন্ন করলে আঁচিয়েও যাবেন এটা নেমন্তন্নের মধ্যেই ধরা থাকে। তেমনি বিয়ে করুন বললে বউকে ঘরে নিয়ে যান এটা নিশ্চয়ই অনুক্ত আছে। এ নিয়ে বিচ্ছিন্ন কোনো সর্ত হয় না কোনোদিন।’

‘বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার ?’

‘আর কিছুর জন্যে নয়, আমার মা একবার দেখতে চেয়েছেন তাই।’

‘আপনার মা জানলেন কী করে ?’

‘যাই হোক, জেনেছেন, আমিই জানিয়েছি যেটুকু জানাবার।’

‘আর কাউকে জানানো যাবে এমন কোনো কথা ছিল ?’

‘জানানো যাবে না এমনও কোনো কথা ছিল না।’

তর্ক করা বৃথা। তাই এণাক্ষী মেয়ের মন জানতে তাকালেন রুচিরার দিকে। জিগগেস করলেন, ‘কি, তুই যাবি নাকি ?’

‘না, না, আমি যেতে যাব কেন ?’ শত রসনায় না করে উঠল রুচিরা।

খুশি হয়ে বালিশের ঢেউয়ে নড়ে-চড়ে বসল এণাক্ষী। জোর পেয়ে বললে, ‘মোট কথাটা ছিল, বিয়েটা হবে, তারপর বিয়েটা যাবে। এর মধ্যে আর কোঁথাও কারু যাওয়াযাওয়ি নেই, খাওয়াখাওয়ি নেই।

এক দস্তখতে হ্যাঁ, আরেক দস্তখতে, না ; হয়ে গেল। যার জন্য টাকা নিয়েছেন সেইটুকুই করুন, কমও নয়, বেশিও নয়, সেইটুকু, বুঝলেন ? তবে আপনার মা যদি চান, তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

'বুঝেছি।' ভাস্কর দরজার দিকে এগোলো।

'নিচে ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাবেন।'

'উনি যদি চান ওঁকে আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন একদিন।'

নিচে নেমে গেল ভাস্কর। চলে যাবার সময় দেখল তরুণ সমিতির কটা চাঁই ছেলের সঙ্গে আলোচনা করছেন জগৎপতি।

'না, না, তরুণ সমিতিকে কে মারবে ?' পরবর্তী সম্পাদক রণেন দত্ত বললে, 'কর্ণধার একজন যায় আরেকজন আসে। নৌকো সামলে দেয়।'

'এই তো তরুণের মত কথা। যতই নদী ঝড়ে উত্তাল হোক, নৌকো কিছুতে ডুবতে দেওয়া নয়।' ড্রয়ার টেনে চেক-বই বার করলেন জগৎপতি। স্বর নিচু করে জিগগেস করলেন, 'তোমাদের প্রাক্তন মাঝির খবর কি ?'

'কোনো খবর নেই। এ'রকম ইরেসপনসিব্‌ল লোক দেখা যায় না।' রণেন দত্ত ঝাঁজিয়ে উঠল। 'দিব্যি পালিয়ে গেল দেশ ছেড়ে।'

'ইরেসপনসিব্‌ল বোলো না, বলো অপরচুনিস্ট।' দলের আরেক-জন টিপ্পনী কাটল।

'অপরচুনিস্ট কথাটা ভালো শোনাচ্ছে না।' আরেকজন ফোড়ন দিল : 'চির-তরুণ।'

দিব্যি সমান-সমান হবার চেষ্টা করলেন জগৎপতি : 'এক সেক্রেটারি না-বলে-কয়ে চম্পট দিল আরেক সেক্রেটারি বিয়ে করে বসল।'

সভ্যের দল হেসে উঠল মন খুলে : 'একেই বলে এস্কেপিস্ট।'

আবার কেন কে জানে হেসে উঠল সকলে।

দিব্যি প্রশ্রয় পেয়ে একজন বললে, 'আমরা তো ভেবেছিলাম দুজন একসঙ্গে পালিয়েছে। তেমনি একটা কানাঘুষো চলছিল সমিতিতে।'

'যা রটে তাই সব সময়ে ঘটে না।'

'কিংবা, রটে একরকম ঘটে অন্যরকম।' একটু বুঝি সংশোধন করলেন জগৎপতি ঃ 'আসল গোপন রেখে নকল নিয়ে খেলা করে। আসলে বিয়ে করবে ভাস্করকে, মেলামেশা শুভময়ের সঙ্গে। কী না জানি কথাটা, ভাজে ঝিঙে বলে পটোল।'

উচ্চহাসির রোল উঠল ঘর ভরে।

'এটাও একটা তারুণ্যের লক্ষণ।' কে মন্তব্য করল।

'তবেই বলো, আমার কি ভাস্করের সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি করা উচিত ছিল?'

'বা, তা কেন, আপনি যুগধর্ম পালন করেছেন।'

তাই রুচিরা সমিতি থেকে বেরিয়ে গেলেও জগৎপতি থেকে গেলেন। থেকে গেলেন ছোকরাদের সহানুভূতিতে, সেই পুরোনো মুরুব্বি হয়ে।

'হলই বা না আমার একমাত্র মেয়ে, হলই বা না অবস্থাপন্ন, তাই বলে কি ওর নির্বাচনে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি?'

'বা, আপনি প্রগতিবাদী, আপনি তা কেন করবেন?'

'তারপরে ভালোবাসার বিয়ে প্রায়ই টেঁকে না।' যেন ভবিষ্যৎ বাণী করছেন এমনি অভ্রান্ত জগৎপতির কণ্ঠ ঃ 'এ বিয়েও টিঁকবে না, ভেঙে যাবে। সেটা সুদিন না দুর্দিন হয়ে আসবে জানি না, কিন্তু সেদিনও আমি তার প্রতিবন্ধক হব না। সবার জীবনে স্বাধীনতাই বড় কথা সেইটেই স্বীকার করে যাব।'

বাড়ির মধ্যে না হয়ে রাস্তায় হলে সবাই জয় দিয়ে উঠত। এই

তো দেশনেতা হবার মত মনোভঙ্গি। এই তো দলের সঙ্গে থাকা, দলকে সঙ্গে নিয়ে চলা।

'তোমরা টাকা চাচ্ছ, নিশ্চয়ই আমি দেব।' দুশো টাকার একটা চেক কেটে রণেনের হাতে দিলেন জগৎপতি ঃ 'ফিস্টি করো সকলে তাতেও আমি রাজি। কিন্তু এ রকম একটা বাজে বিয়ের জন্যে ফিস্টি—এতে মন উঠছে না।'

'বাজে বিয়ে, স্যার ?'

'বাজে মানে আর কিছু নয়, অসরল বিয়ে। দেখালে একজনের সঙ্গে, করলে আরেকজনকে। এবং তারই আভাস পেয়ে শুভময় বিবাগী হল কিনা তার ঠিক কী!' ঠিক অবাধ গলায় বলতে পারছেন জগৎপতি ঃ 'তাই সাধে কি আর বিয়েতে নেমন্তন্ন করিনি কাউকে? মনের দুঃখ মনেই চেপে গিয়েছি। হত দুই সেক্রেটারির বিয়ে, শুধু ক্লাব-হাউস কেন, পাড়া-কে-পাড়া আমরা ইলিউমিনেট করতাম।'

'তাই বিয়ের নামে ফিস্টি করা নয়। স্যার ঠিকই বলেছেন। এ ফিস্টি' রণেন ঘুসি তুলে ঘোষণা করল ঃ 'আমাদের প্রেসিডেণ্টের জন্মদিন উপলক্ষে।'

'আমার জন্মদিন? সে তো— জগৎপতি আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

'যেদিনই জন্মদিন হোক কিছু এসে যায় না।'

'আমরা যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে জন্মাতে পারি। প্রতিদিনই আমাদের জন্মদিন।'

'আর সেইটেই তারুণ্যের চিহ্ন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন জগৎপতি।

ঘুসি তুলে আওয়াজ দিতে-দিতে বেরিয়ে পড়ল ছেলেরা। জগৎপতি জনপ্রিয়তার তুঙ্গতর শৃঙ্গে এসে উঠলেন।

ভিতরে গিয়ে দেখলেন স্ত্রী আর মেয়ের মধ্যে একটা তপ্ত স্তব্ধতা থমথম করছে।

'কি, ভাস্কর এসেছিল না? চলে গিয়েছে? আমার সঙ্গে দেখা করল না তো? কী বলে গেল?'

'বলে গেল তোমাকে ওদের ওখানে পাঠিয়ে দিতে।' এণাক্ষী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে।

উপর-উপর শুনেই আর সিদ্ধান্ত করতে রাজি নন জগৎপতি। জিগগেস করলেন, 'ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার রুচিকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়।'

'কেন?'

'ওর মাকে বউ-দেখাবে বলে।'

রুচিরা সামনেই, তবু এণাক্ষীকেই জিগগেস করলেন জগৎপতি, 'রুচি কী বললে?'

'যা বলবার তাই বললে। বললে এমন কোনো সর্ত ছিল না ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে বউ হয়ে।'

'তার মানে 'না' করে দিল?'

'হ্যাঁ, বাবা, 'না' করে দিলাম।' রুচিরাই বললে অকপটে।

'একেবারে কাঠখোট্টা 'না' করে দেওয়াটা ঠিক হয়নি।' জগৎ-পতি মুখে চিন্তার রেখা টানলেনঃ 'যাব-যাচ্ছি যাব-যাচ্ছি করে ছলনায় ভুলিয়ে রাখা উচিত ছিল। চটিয়ে দিলে কাজ ভালো হবে না।'

'না, না, আর ছলনা নয়। চটলে চটুক। যা হবার তা হোক। আমি কিছুতেই ও বাড়ি যাব না।' রুচিরা আবার কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল।

'তা তো যাবি না, কিন্তু ওর হাতে এখনো রঙের টেক্কা।'

'বলতে চাও, প্রতিশোধ নেবে? ডিভোর্সটা দেবে না? না দিক।'

খরতর জ্বলে উঠল রুচিরা : 'তবু, তবু ও পাবে না আমাকে। যাব না ওর বাড়ি। যাকে আমি ভালোবাসিনি, যার প্রতি আমার ভালোবাসা জাগেনি, তাকে আমি স্বামী বলে পারব না মেনে নিতে। না, কখনো না। ডিভোর্স না দিল তো বয়েই গেল।'

'কিন্তু এর চেয়ে আরো বড় অস্ত্র তার হাতে আছে।'

'সে কী ?' এণাক্ষী বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'সে কোর্টে গিয়ে রেস্টিটিউশন অফ কনযুগেল রাইট চাইতে পারে। বলতে পারে, কোনো সঙ্গত কারণ নেই, স্ত্রী স্বামীর থেকে আলাদা থাকছে। মামলার ডিক্রি পেয়ে জারি করে জোর করে নিয়ে যাবে স্ত্রী।'

'সে ডিক্রি আমি মানব না।'

'কোর্টের ডিক্রি মানবি না কী !'

'না মানব না, আমি আত্মহত্যা করব, খুন করব।' কাঁদতে-কাঁদতে উঠে পড়ল রুচিরা, দেয়াল ধরে দাঁড়াল টাল রাখতে : 'যে করেই হোক আমি ফিরিয়ে নেবই আমার স্বাধীনতা। একটা ভুল করেছি বলে আর আমার মুক্ত হবার নির্মল হবার অধিকার নেই, এ হতেই পারে না। এত বড় জীবন! এত বড় পৃথিবী! শুধু আমারই স্থান নেই ?'

এদিকে কী এক অশরীরী আতঙ্ক দেখে এণাক্ষী টলে পড়ছিল, জগৎপতি ধরে ফেললেন। আস্তে-আস্তে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। খবর পাঠালেন ডাক্তারকে।

রুচিরাকে বললেন, 'এখুনি এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? মামলার কথা বললুম বলে কী! মামলার ডিক্রি পাওয়া কি সোজা কথা ? তবে আমি আছি কী করতে ?'

এ সবে সান্ত্বনা নেই রুচিরার। তার আশ্বাস এখনো বিশ্বাসে। শত নষ্ট-ভ্রষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মানুষ সৎ হতে পারে সত্যাশ্রয়ী হতে পারে এই প্রত্যয়ে।

কিন্তু তাই বলে জগৎপতি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। ক'দিন পরে গাড়ি নিয়ে ভাস্করদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন এক ছুটির দিন।

মহালয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ঃ 'বৌমা এল বুঝি।'

উৎসুক হয়ে তাকাল ভাস্কর। সোমনাথ তো বাইরেই ছুটে এল। না, জগৎপতি একাই এসেছেন। সঙ্গে রাজ্যের জিনিসপত্র কাগজের বাক্স-প্যাকেট খাবার-দাবার। নিজের হাতে করে, কিছুটা বা সোমনাথের সাহায্যে, নামালেন একে-একে। স্তূপীকৃত করে তুললেন।

'বৌমা এল না বুঝি ?' মহালয়াই এগিয়ে এসে কথাটা পাড়ল।

'আসবে, আজই আসবে। ভাস্কর, তুমি আজ দুপুরে আমাদের ওখানে খাবে, আর বিশ্রাম করে বিকেলে ফেরবার সময় নিয়ে আসবে রুচিকে।'

প্রথমে নিষ্প্রাণ জিনিসগুলি দেখে ভাস্করের ইচ্ছে হয়েছিল, প্রত্যাখ্যান করে দেয় ; কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়েছিল কোন সততায় সে প্রত্যাখ্যান করবে, সে তো এমনি ঘুষ নিতেই অভ্যস্ত। এখন রুচিরা আসবে জেনে মন খুশিতে টলমল করে উঠল, দেখতে চাইল কী কী জিনিস, কার জন্যে কী। মা'র জন্যে গরদ, দু ভাইয়ের জন্যে ধুতি, অর্ডার না দিয়ে কেনা যায় বলে রঙ-বেরঙের বুশ-শার্ট, রুমাল। আর নীল দড়ি দিয়ে বাঁধা বাক্সে সন্দেশ আর শোনপাপড়ি।

'আসবে তো, কিন্তু এইটুকু তো আমাদের বাসা।' মহালয়া দিব্যি দরদ আনল কণ্ঠে ঃ 'থাকবে কী করে ?'

'এখন তো একবার আপনাকে দেখা দিতে আসা। তাতে তো আর এইটুকু বাসাতে আটকাবে না।' জগৎপতি অনায়াসে মায়ায়-মমতায় কণ্ঠস্বর আর্দ্র করলেন ঃ 'কদিন পরে যখন স্থায়ীভাবে থাকতে আসবে তখন অবশ্য কুলোবে না এখানে।'

'তখন কী হবে?'

'তখন একটু বড় দেখে ফ্ল্যাট নিতে হবে। কিন্তু,' সারল্যে ভরপুর হয়েই বললেন জগৎপতি ঃ 'সময়কালেই তো আর মনোমত ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না, তাই সেটা এখন থেকেই ভাড়া নিতে হবে।'

'আমিও তো কবে থেকেই তাই বলছি ভাস্করকে। এখন বিয়ে করলি, বউ আসবে, আমার গোপাল আসবে, একটা বড় দেখে বাসা নে।' মহালয়া অনুযোগ করে উঠল ঃ 'কিন্তু ছেলের আমার গা হয় না। গোপালের কৃপায় মাইনেও তো বেশ বাড়ল।'

'না, না, ও মাইনেতে কী করে পারবে? আমি একটা দেখেও এসেছি। এই কাছেই। দোতলায় তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট—'

'তিনখানায় প্রচুর হয়ে যাবে আমাদের।' যেন আর কিছু দেখতে হবে না এমনি ত্বরিত স্ফূর্তিতে বলে ফেলল মহালয়া।

'কিন্তু ভাড়া কত?' ছন্দভঙ্গের মত প্রশ্ন করল ভাস্কর।

'একশো ষাট টাকা।'

শীর্ণ হয়ে গেল মহালয়া। এক ফুঁয়ে নিবে গেল ভাস্করের মুখ।

'আমাদের পক্ষে বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' মহালয়া তাকাল কাতর চোখে।

'বেশি মানে? সামর্থ্যের বাইরে হয়ে যাচ্ছে। অতগুলো টাকা শুধু বাড়িভাড়াতেই বেরিয়ে গেলে ভাস্কর খাবে কী? শ্বেতহস্তী পুষবে কী দিয়ে?'

জগৎপতি বুঝতে পারলেন শ্বেতহস্তীর ইঙ্গিতটা এদের পক্ষে একটু কঠিন হচ্ছে।

তাই নিজেই পরিষ্কার করলেন ঃ 'শ্বেতহস্তী মানে বড়লোকের মেয়ে। আপনার ছেলের বউ।' তাকালেন মহালয়ার দিকে ঃ 'শ্বেতহস্তী পোষা কি চারটিখানি কথা? আজকাল কি আর সেই সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ আছে যে স্বামীর সঙ্গে বনে হয় তো বনেই

যাবে, কাঠ কাটতে হয় তো কাঠই কাটবে কোমর বেঁধে? স্বামী গরিব বলে আমি, বড়লোকের মেয়ে, আমি তার সংসার করব না, বা তাঁর ঘর আমার মাপে ছোট মনে হবে এ নিদারুণ অন্যায়—'

'কিন্তু ও নিয়ে আপশোস করা বৃথা।' মহালয়াই যোগ করল।

'হ্যাঁ, উপায় নেই। বাস্তব বাস্তব।' বললেন জগৎপতি, 'তাই ঠিক করেছি ও ফ্ল্যাটটার ভাড়া আমি দেব।'

'আপনি দেবেন?' মহালয়ার চক্ষু স্থির।

'হ্যাঁ, জামাইকে লোকে যৌতুক দেয় না? মাসিক একশো ষাট টাকা ভাড়া এমন কি আর বেশি কথা? তাই ভাড়া দেবই শুধু ঠিক করিনি, ভাড়া নিয়েও নিয়েছি ফ্ল্যাটটা।'

'নেওয়া হয়ে গিয়েছে?' মহালয়ার দুই চোখে বিস্ময় আর ধরছে না।

আরো বিস্ময় সোমনাথের মুখে-চোখে। 'ফ্ল্যাটটা দোতলায়?' কোনদিন দোতলায় থাকেনি সেই অপূর্বের অনুভবে রঙিন এখন সোমনাথঃ 'সিঁড়িটা কোন দিক দিয়ে? কতটা লম্বা? কতগুলো ধাপ আছে?'

'নিচে দোকান আছে দু-তিনটে। পাশ দিয়ে গলি, আর সেখান থেকেই উঠে গিয়েছে সিঁড়ি।' জগৎপতি তরতর করে বলে চললেনঃ 'মাস খানেকের মধ্যেই ফ্ল্যাটটা খালি হবে আর তক্ষুনি ঢুকে পড়বেন আপনারা। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি, বাড়িওলাকে দিয়েছি সেলামি আর দু মাসের য়্যাডভান্স।'

কিন্তু কতদিন আপনি ভাড়া টানবেন? এমন একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উঁকি মারল ভাস্করের চোখে। জানি, কত দিন। বড় জোর এক বছর। অর্থাৎ যত দিন না ছাড়পত্রে সই করে দিচ্ছে। তারপর? তারপর কি পুনর্মূষিক নয়?

ভাস্করের এই অস্বস্তিটা টের পেলেন জগৎপতি। বললেন,

'কথা হচ্ছে বাড়িওলা গোটা বাড়িটা বিক্রি করে দেবে। তা যদি হয়, যত দাম হোক, কতই বা আর হবে, আমি কিনে নেব। আর যদি ওটা শ্বশুরের বাড়ি হয়, তাহলে কি আর জামাইকে ভাড়া গুনতে হবে? গুনতে হলেও সে নিশ্চয়ই নমিন্যাল, নামমাত্র হবে কিছু। গায়ে লাগতে দেবে না। কী, তাই নয়?'

দুর্বল রেখায় ভাস্কর হাসল। পরের কথা পরে। এই মুহূর্তে যা সহজ তা আসুক সহজ হয়ে। সহজ সুখই বুঝি সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য।

চলে যাবার ভঙ্গি করলেন জগৎপতি। ভাস্কর এগিয়ে দিতে এল।

'যেও বারোটা নাগাদ।' জগৎপতি মনে করিয়ে দিলেন।

'খাওয়াটা থাক।'

'থাকবে কেন?'

'ঠিক একটা সুস্থ পরিবেশ হবে না।'

'হবে না মনে করছ? তা হলে থাক।' জগৎপতি দিব্যি ফিরিয়ে নিলেন কথা। সদাশয় মুখে বললেন, 'তাহলে বিকেল চারটে নাগাদ যেও। একটু চা খেও না হয়। তারপর নিয়ে এস রুচিকে। রুচি তৈরি হয়ে থাকবে।'

চারটে নাগাদই গেল ভাস্কর।

আর চারটে নাগাদই এল ডাক্তার।

'এই যে তুমি এসেছ। ভালোই করেছ।' জগৎপতি ভাস্করকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে পড়লেন: 'খানিকক্ষণ আগে থেকে কী রকম একটা 'পেন' উঠেছে—'

'চলুন দেখি—' বললে ডাক্তার।

দুজনে উঠছে সিঁড়ি দিয়ে, ভাস্কর ভাবতে চেষ্টা করল অসুখটা কার। রুচিরার, না, মা'র।

আর, সন্দেহ রইল না কার, যখন উপর থেকে জগৎপতি ডেকে উঠলেন ভাস্করকে: 'এস, তুমিও চলে এস।'

ভাস্কর নিচে থেকেই বললে, 'আমি 'পেন'-এর কী বুঝি ?'

'এটিই বুঝি জামাই ?' জিগগেস করলে ডাক্তার।

সানন্দ মুখে স্পষ্ট সায় দিলেন জগৎপতি। বললেন, 'নিয়ে যেতে এসেছে।'

নিচেই অপেক্ষা করতে লাগল ভাস্কর। খেলাটা শুধু দেখে যেতে হবে না, খেলাটা খেলে যেতে হবে।

কতক্ষণ পরেই স-ডাক্তার নামলেন জগৎপতি।

রুগীর কী অবস্থা, ব্যাধির কী গতি-প্রকৃতি সে-সব উপরেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে, এখন যেটা সব চেয়ে জরুরি সেটা ভাস্করের সামনে বলা দরকার। তাই জগৎপতি প্রশ্ন করলেন ডাক্তারকে: 'এ অবস্থায় হাঁটা-চলা কি ঠিক হবে ?'

'কখনো না। এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম।'

দোরগোড়ায় ডাক্তারকে ফি দিলেন জগৎপতি, আর যেহেতু রুচিরার যাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল সেই হেতু বুঝলেন ভাস্করকেও কিছু ফি দেওয়া দরকার। বললেন, 'একবার উপরে যাও। 'রুচি তোমাকে খুঁজছিল, কী যেন বলবে।'

'না, বলবে আবার কী! তার তো এখন বিশ্রাম প্রয়োজন।' বলে সটান বেরিয়ে গেল ভাস্কর।

এণাক্ষীর ঘরেই বসেছিল রুচিরা, যাতে ভাস্কর হঠাৎ ঘরে ঢুকে রুচিরাকে না একা পায়। যদি একা ঘরে ঢোকে তাকে তো অনধিকার প্রবেশ বলা চলবে না, আর যদি নিয়ে যাবে বলে হাত ধরে টানাটানি করে তা হলেও বলা চলবে না বলাৎকার। শত হ'লেও আইনের চোখে স্বামী, ডাকাত পড়েছে বলে চেঁচামেচি করলে তো সিদ্ধ হবার নয়। তাই জোরে না পারি বুদ্ধিতে পারব।

জগৎপতি এসে বললেন, 'খুব চটে গিয়েছে।'

'তা চটুক। চলে গিয়েছে তো ?' এণাক্ষীর বুক থেকে পাথর

নামল ঃ 'ও চলে গিয়েছে শুনলেই আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়।'

'এখনো সম্পূর্ণ চলে গেল কই ?' নিশ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ করলেন জগৎপতি।

'তুমি এত পারো, এটা পারো না ?' রাতে ভালো ঘুমুতে পারে না এণাক্ষী, তাই এই দুরভিসন্ধিটা চোখে জ্বলবার সঙ্গে-সঙ্গে তাকে কেমন পাগলের মত দেখাল।

'বিবেকের ভয় তো নয়, ভাগ্যের পরিহাসে ধরা পড়ে যাবার ভয়।' স্থির মাথার লোক, বললেন জগৎপতি ঃ 'যার জন্যে গোড়াতেই রুচির জন্যে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারলাম না।'

মোটেই তার জন্যে নয়। ভঙ্গিতে এই ভাবটা ফুটিয়ে রুচিরা চলল তার নিজের ঘরের দিকে। পাপ বলতে চাও বলো, কিন্তু আসলে এ প্রতিবাদ। সে এই প্রতিবাদ, এই জীবন্ত প্রতিবাদ নিয়েই চেয়েছিল বেঁচে থাকতে। পরে ঘটনাটা যে ভাবে ঘুরল, তাতে তার কোনো হাত নেই। যে কোনো ভাবে, যে কোনো দিক থেকেই হোক, দুঃখ আসবেই। দুঃখ-না এলে পাপকে পোড়াবে কে, কী করে হবে জীবনের শুদ্ধিস্নান!

রুচিরা তার নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল।

কোনো টান নেই কোনো আকর্ষণ নেই, গরিবানার মোহ তার ভেঙে গিয়েছে, তবু মানুষ হিসেবে ভাস্করের প্রতি একটু মায়া কোন না আছে রুচিরার। শত হলেও পরোপকার তো করেছে, প্রত্যাখ্যাতার কলঙ্কমোচন করেছে, একটা অপ্রার্থিত জন্মকে তো জীবনের অধিকারী করেছে, সেই দিক থেকে কিছু মূল্য তাকে দেবই, কিন্তু তাই বলে সামান্য বেগুনওয়ালা হয়ে সে যেন হীরের দাম না চায়, হাতের চেয়ে গ্রাস-না বড় করে।

ডিক্রি করে বউ দখল নেবে ? যেখানে প্রাণ নেই সেখানে তো মাংসপিণ্ডও নেই।

১৩

আপিসে টেলিফোন করলেন জগৎপতি : 'কে, ভাস্কর ? হ্যাঁ, তোমার মাকে বোলো তাঁর একটি নাতি হয়েছে। নবজীবন নার্সিং হোমে আছে। ভালোই আছে দুজনে। তোমার মাকে নিয়ে একদিন এস। আর, হ্যাঁ, বার্থ রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলো।'

'ঠিক আছে।'

মহালয়া তো শোনামাত্রই যাবার জন্যে পাগল। ছেড়ে দে, আমি আমার গোপালকে দেখে আসি।

'বউ দেখল না, ছুটল নাতি দেখতে !' বিদ্রূপ করল ভাস্কর।

'বউয়ের উপর আমার অভিমান হতে পারে কিন্তু গোপালের উপর আমার অভিমান কী !'

'কিন্তু গোপালকে তুমি চিনবে কি করে ?' ভাস্কর তরল পরিহাসের সুরে বললে, 'দেখলে এক ভদ্রমহিলা একটা ছেলে কোলে করে বসে আছে, তুমি কী করে বুঝবে ঐ ভদ্রমহিলা তোমার পুত্রবধু ?'

'তুইও চল, তুই সনাক্ত করে দিবি।' মহালয়া আবেশভরা মুখে বললেন, 'তুইও দেখে আসবি তোর গোপাল।'

'আমার বয়ে গেছে ! আমি নতুন বাড়িতে, দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে এসেছি। ঘর-দোর সাজিয়েছি-গুছিয়েছি, কোনো অসুবিধেই রাখিনি, এবার সে আসবে সংসার করতে। আমি ততদিন অপেক্ষা করব।'

'কিন্তু আমার যে তর সইছে না।'

'যে গোপাল তোমার মান রাখল না, নিজের থেকে এল না তোমার কাছে, তোমার কোলে, তাকে দেখবার জন্যে কেন তোমার মাথাব্যথা.?'

'আমার কত দিনের সাধ পাব আমার গোপালকে।'

'তার মানে আমাকে পাবার আগেই তোমার গোপাল পাবার ইচ্ছে। ধৈর্য ধরো। যদি সত্যিই গোপাল হয় সে নিজের থেকেই তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

ফার্নিচারও জগৎপতিই কিনে দিয়েছেন, পর্দা-কার্পেটও তাঁর পয়সায়। এ সব ঠাট-ঠমক না হলে সে আসবে না। পরোক্ষে এটাই বলা যে, যেহেতু তোমার সাধ্য নেই এই সাজ-সজ্জার উচ্চ-স্বরটা বজায় রাখো, পুষতে পারবে না এই ঐরাবতকে। আড়ম্বর ছাড়া কি ঠাকুরাণীর পূজা হয়? সুতরাং, ছেড়ে দাও, তপ্ত কয়লার টুকরো ফেলে দাও হাত থেকে, যে বয়ে যেতে এসেছে তাকে বয়ে যেতে দাও।

নতুন ফ্ল্যাটে বদলি হতে ইচ্ছে ছিল না ভাস্করের। এ যেন তারই অসামর্থ্যকে রঙিন পেন্সিলে দাগ দিয়ে দেখানো। কিন্তু ন্যায্য বিবাহেও তো স্ত্রীকে নিয়ে সংসারে বিস্তৃত হবার তাগিদে বড় বাড়ির খোঁজ পড়ে। তা ছাড়া তার তো নগদা বিদায়ের পালা, যা হাতে আসে তাই সে লুফে নেবে না কেন, কেনই বা লুটে নেবে না? দুদিনের বৈরাগীই তো ভাতকে প্রসাদ বলে নেবে।

ভাস্কর জানে, দুদিন পরে সমস্ত কিছু তাসের ঘরের মত উড়ে যাবে, আবার সে নেমে আসবে তার বিবর্ণতায়। তাই সে পুরোনো বাড়িটা ছাড়েনি, পুরোনো বন্ধু, সদাব্রতকে এনে বসিয়েছে, ভাড়া চলছে আগের নামে। ভয় আছে, সে-দুর্দিনে বন্ধু আবার না বিশ্বাসঘাতকতা করে। স্বত্ব না থাক, মাত্র দখলের জোরে না পথ আটকায়।

আসতে হলে এখানেই আসত। কোনো অল্পতাই বেশি হত না। কিন্তু কেন আসবে? কিসের টান কিসের আকর্ষণ কিসের প্রাবল্য? কী তার আছে যাতে সে মূল্যবান বলে প্রতিভাত

হতে পারে? কুড়িয়ে নিতে পারে সমস্ত মন, সমস্ত শরীর, সমস্ত সার-সত্তা? কিছুই নেই। শুধু ফাঁকা আওয়াজে কার বুক সে বিদ্ধ করবে?

না, ফাঁকা আওয়াজ কে বললে? আইনের শিলমোহর করা দস্তখৎ। সে দস্তখতের পিছনে সমস্ত রাজশক্তি, সমস্ত উদ্যত বেয়নেট। সে-অধিকারই বা সে প্রতিষ্ঠিত করবে না কেন? কেন এক ক্ষণগর্বিতার ঔদ্ধত্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে না? কেন ক্ষুদ্র একটা খেয়ালের সামনে সে সমস্ত পুরুষশক্তিকে, সমাজ-শক্তিকে নিষ্প্রভ করে রাখবে? সে ছাড়বে কেন, সে ঠকবে কেন, কেন সে তার প্রাপ্তব্যকে কড়ায়গণ্ডায় আদায় করে নেবে না? হোক তা এক পিণ্ড ইচ্ছাহীন মাংস, তাতেই সে অপূর্ব নৈপুণ্যে পারবে প্রাণ এনে দিতে, সমস্ত বৈমুখ্যকে নিয়ে যেতে আনুকূল্যে। পারবে না? পারা যায় না কোনো দিন? একটা ভালো-লাগাকে ফলিয়ে তোলা যায় না ভালোবাসায়?

কত আর ধৈর্য ধরবে, বাধা-বিপদ ডিঙিয়ে সোমনাথকে নিয়ে মহালয়াই একদিন গিয়ে হাজির হল। সুবিধেই হল হয়তো, জগৎপতি ভাবলেন। বিরোধটা তাহলে একটা একক গাছে আবদ্ধ না হয়ে সমগ্র অরণ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এণাক্ষীর কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এণাক্ষী নিয়ে গেল রুচিরার ঘরে। সর্বভোলা কোনো-কিছুর ধার-না-ধারা নির্বাধ শিশু খাটের আধখানার অনেক বেশি জায়গা জুড়ে রাজ্য বিস্তার করে ঘুমুচ্ছে, পাশে আধশোয়া রুচিরা।

পলকে বুঝে নিল মহালয়া। 'এই যে আমার গোপাল।' পরিপ্লাবী স্নেহে ঝুঁকে পড়ল মহালয়া: 'আমার কত সাধনার ধন।'

একটা ফিটফাট পোশাকের ছিমছাম ধাই—সম্ভ্রান্ত নাম আয়া না নার্স—পাশেই ছিল, শাসন করে উঠল: 'অত ঝুঁকবেন না।'

'না, ঝুঁকছি না।' একটু বুঝি সরে গেল মহালয়াঃ 'দেখছি আমার গোপালকে। মাথাভরা কী সুন্দর চুল! কী নাক-চোখ-কপাল! একেবারে আমার ছেলেবেলার ভাস্কর।'

এণাক্ষী রুচিরাকে বললে, 'ইনি ভাস্করের মা।'

'আমি তোমার শাশুড়ি। আর তুমিই আমার ঘরের লক্ষ্মী, যশোমতী।' রুচিরার চিবুক ধরে একটু আদর করল মহালয়াঃ 'আমার বউমাও বা কী সুন্দর!'

রুচিরা হাত তুলে নমস্কার করল। পাশে চেয়ার দেখিয়ে বললে 'বসুন।'

সোমনাথও স্নেহ-কৌতূহলে আক্রান্ত হবার আগেই নার্সের ইঙ্গিতে দূরে সরে গিয়ে এক কোণে একটা সোফায় গিয়ে বসেছে।

মহালয়া সরল না, খাটেই জায়গা করে নিয়ে বসল। নার্সকে বললে, 'গোপালকে একটু আমার কোলে দেবে?'

'দেখছেন না ঘুমুচ্ছে।' নার্স আবার শাসন করল।

'আহা, গোপাল খানিক জাগে খানিক ঘুমোয়, তাতেই তো রাত-দিন, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ। যদি একটু জাগেও, আবার আমার কোলে এসে গোপাল ঘুমিয়ে পড়বে।'

এণাক্ষীর অসহ্য লাগছিল, বললে, 'কী অমন একটা বিশ্রী নামে ডাকছেন?'

'গোপাল বিশ্রী নাম?'

'নিশ্চয়ই। গরু, গরুর পাল এ-সব আবার কী নাম? ও সব নাম আজকাল চলে নাকি?' এণাক্ষী গর্ব ফুটিয়ে বললে, 'আমরা অন্য নাম রেখেছি।' এমন একখানা ভাব করল, শিশু যেন ওদেরই একলার শিশু, আর কারু নাম রাখবার এক্তিয়ার নেই।

'কী নাম?' তবু জিজ্ঞেস না করে পারল না মহালয়া।

'অসীম।'

'বা, অসীম তো খুব ভালো নাম। আমার গোপালই তো অসীম—অনন্ত—অশেষ।'

তবু গোপালকে কেউ মহালয়ার কোলে তুলে দিল না। নার্সের চোখ পাহারা দিচ্ছে।

তখন মহালয়া রুচিরার দিকে মনোযোগ দিল। জিগগেস করল ঃ 'নার্সিং হোম থেকে ফিরেছ কত দিন ?'

এণাক্ষীর মুখের দিকে তাকাল রুচিরা। বললে, 'দিন সাতেক।'

'নার্সিং হোমে ছিলে কদ্দিন ?'

'দু সপ্তাহ।'

মহালয়া হিসেব করে দেখল, অনায়াসেই প্রণাম করতে পারত রুচিরা। প্রণাম কি আর পুরো করতে হত নত হয়ে ? সেই নম্রতার ঠাণ্ডা ভঙ্গিটুকু করতে না করতে মহালয়াই তাকে নিরস্ত করত।

'নিজের ঘরে কবে যাবে ?'

যা হোক রুচিরাই তো উত্তর দেবে, তা নয়, এণাক্ষী বললে, 'সে ডাক্তার জানে। শরীর এখনো—'

'তা হলে আজ আসি।' আবার গোপালের কাছে এগিয়ে গেল। ছোট দুটি সোনার বালা তার হাতে ঠেকিয়ে রাখল বালিশের কাছে। শক্ত জিনিস এত কাছে রাখা উচিত নয় সেই ওজুহাতে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখল নার্স।

মহালয়া চলে যেতে-যেতে আবার ফিরল। বললে, 'আমি আবার আসব। সেদিন নিশ্চয়ই গোপালকে জাগা দেখব। শুনব তার মিষ্টি কান্নার বাঁশির সুর।'

'যদি আসেন তো একটু জানিয়ে আসবেন।' মনে করিয়ে দিল এণাক্ষী।

নেমে যাচ্ছে, মহালয়া শুনতে পেল শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ। ওই, ওই

আমাকে ডেকেছে। এবার সোমনাথ ধমকাল। তাই আর ফিরতে পেল না মহালয়া।

বাড়ি এসে ভাস্করকে বললে, 'ওরা এমন একটা ভাব দেখাল যেন গোপাল ওদেরই সব, আমাদের কেউ নয়।'

'কবে আসবে তার কিছু আভাস দিলে?'

'কিছুমাত্র না। ডাক্তারের উপর বরাত দিলে।' মহালয়ার মুখ থমথমে হয়ে উঠল: 'মনে হচ্ছে আমাদের ওর সব কিছু অপছন্দ। স্বামী অপছন্দ, শাশুড়ি অপছন্দ। বাড়িঘর লোকজন আচারবিচার নামধাম—সমস্ত।'

'শুধু ওর ছেলে পছন্দ।'

'কিন্তু ছেলে তো ওর নয়, ছেলে আমাদের। ও না আসে তো না আসুক,' মহালয়াও দৃঢ় হতে পারল: 'আমাদের ছেলে আমাদের দিয়ে দিক।'

কতদিন পরে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, দুপুর বেলা, রিকশা করে বেরিয়ে পড়ল মহালয়া। কে তাকে আটকায়, সোজা উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে, এদিক ওদিক না তাকিয়ে একেবারে তার গোপালের কাছটিতে।

'কেমন আছ বৌমা?'

ছেলেটা জেগে আছে, খাটের কাছে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল রুচিরা, প্রশ্ন শুনে চমকে তাকাল পিছন ফিরে। বললে, 'এ কি, আপনি?'

'কেমন আছ?'

'ভালো নয়।' রুচিরা এক রাজ্যের অসন্তোষের মুখোস আঁটল মুখে।

'আর আমার গোপাল?' মহালয়া তাকিয়ে দেখল গোপাল আজ জেগে আছে, তাকিয়ে আছে, সমস্ত আকাশ চন্দ্রে-সূর্যে আলো করে আছে। তাকিয়ে দেখল নার্সটা আজ নেই, বিদায়

হয়েছে কুচক্রীটা। অবাধে তাই গোপালকে বুকে তুলে নিল মহালয়া, আদরে আনন্দে আঘ্রাণে অনুভবে নতুন এক আস্বাদের অধ্যায়ে চলে এল।

'কেমন ঠাণ্ডা ছেলে, কেমন বড়সড় হয়ে উঠেছে।' তার গোপালের কত রূপ কত গুণ বলে শেষ করতে পারছে না মহালয়া।

রুচিরা ভাবছিল, সমস্তই কেমন মায়া আর মায়াই কেমন মধুময়। নইলে অজান্তে তারও চোখে ঘোর লাগে কেন? একটা বৈধতার আবরণ পড়েছে বলে নির্ভর হয়ে সেও তাকাতে পারছে শিশুর দিকে, চোখে বুকে আনতে পারছে মমতা। যা লজ্জার ছিল তা এখন আনন্দের হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, সমস্তই তা হলে ভ্রম-প্রমাদ-অসারল্য?

হঠাৎ তন্ময়তায় ধাক্কা খেল যখন শিশুকে সরিয়ে রেখে মহালয়া জিগগেস করলে, 'এখন তো বেশ সুস্থ হয়েছ, এবার তবে কবে বাড়ি যাবে?'

'না এখনো সুস্থ হয়নি।' মুখ নিচু করে বললে রুচিরা।

'তোমার সত্যি কী হয়েছে তাই বলো তো। কেন তুমি যেতে চাচ্ছ না নিজের জায়গায়?'

'তা হলে আপনাকে বলি।'

'বলো।' ঘেঁসে কাছে এল মহালয়া।

'আপনার ছেলে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে।'

'প্রবঞ্চনা? সে কী?'

'বলেছিল সে হ্যানো-ত্যানো পাশ, কোন সদাগরী আফিসে বিরাট কী চাকরি করে, নিজেদের বাড়ি আছে, আরো কত কী। এখন বিয়ের পর দেখছি সমস্ত ভুয়ো, আগাগোড়া মিথ্যে। সে দেখছি গরিবের গরিব, অকর্মণ্য, অশিক্ষিত। যার জীবন এত বড় একটা মিথ্যার কারবার তার সংসার করতে আমার মন ওঠে না।'

'তুমি বলো কী ? ভাস্কর আমার কখনো এত হীন হতে পারে ?' মহালয়া রাগবে না কাঁদবে ভেবে পেল না ঃ 'তাই যদি হবে তবে তোমার বাবা তাকে এত যৌতুক দিলেন কেন ?'

'তারই জন্মে দিলেন। আশা করলেন আমি যদি যাই, কত কমে আমার চলতে পারে। আমি বলি কি, আমি যখন এই প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দিতে রাজি নই, তখন আমাকে আপনারা ত্যাগ করুন।' স্থির তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রুচিরা ঃ 'বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে নিন।'

'আর আমার গোপাল ?'

মহালয়া চেঁচিয়ে উঠল।

'আপনাদের ছেলে আপনারা নিয়ে নিন। আমার কিছু আপত্তি নেই।' রুচিরা কান্নায় করুণ মুখে বললে, 'আমি আবার আমার কুমারী জীবন পেতে চাই। আমার সেই পবিত্র জীবন, স্বাধীন জীবন।'

এ যেন কী রকম অন্য রকম হয়ে গেল। ভাবনায় পড়ল মহালয়া। তবু চলে যাবার আগে একবার চেষ্টা করল প্রলেপের হাত বুলোতে, বললে, 'তেমন যদি কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে, তা এখন ভুলে যাও। তোমার গোপাল এসেছে, তোমার আর কী দুঃখ! যাই হোক ভদ্রস্থ চাকরি-বাকরি হয়েছে এখন ভাস্করের, তাকে মার্জনা করে নিতে দোষ কী। তা ছাড়া তুমি এত বড় বাপের মেয়ে, একমাত্র ওয়ারিশ—তোমার কিসের ভাবনা ?'

'না, না, আমি প্রবঞ্চকের ঘর করি না।' দু হাতে মুখ ঢেকে অঢেল কেঁদে ফেলল রুচিরা ঃ 'যে কথা দিয়ে কথা রাখে না সে আমার শত্রু।'

তবু গোপালের দিকে ফিরে তাকাল মহালয়া। বললে, 'তুমি যখন এসেছ তখন সব গোলমাল মিটিয়ে দাও।'

বাড়িতে ফিরে এসে ভাস্করকে সব বললে মহালয়া।

ভাস্কর বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হল না। শান্ত মুখে বললে, 'আদ্যোপান্ত মিথ্যে। নিজের অহঙ্কারকে ঢাকা দেবার ছলনা। তুমি ওদের ওখানে যাও কেন? যেও না।'

'যে স্ত্রী স্বামীর নামে এত মিথ্যে রটায় তাকে নিয়ে আবার ঘর করা কী। জানি না কী করে বিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় আজকাল। যদি দেওয়া যায়,' মহালয়া অকুণ্ঠ মনে বললে, 'তা হলে ছাড়িয়েই দেওয়া উচিত।'

ভাস্কর বুঝেছে কেন এ মিথ্যের অবতারণা। শুধু বিয়ে ভাঙার প্রেরণাকে সচেতন করবার জন্যে। মাকেও সেই প্রেরণার আবেগ জোগাবার কাজে নিযুক্ত করবার জন্যে।

মুখে বললে, 'একশোবার উচিত।'

একটু বুঝি বা অসহিষ্ণু হয়েছে মহালয়া। 'তা হলে এখন তুই কি করবি?'

'আপাতত চুপ করে বসে থাকব।'

'চুপ করে বসে থাকবি? সে আমি সহ্য করতে পারব না। আমাকে তা হলে কাশীতে দিদির বাড়ি পাঠিয়ে দে।'

ভাস্কর চুপ করে রইল।

কিন্তু চুপ করে থাকতে তাকে দিচ্ছে কে? কদিন পরে জগৎপতি এসে হাজির।

'বার্থ রেজিস্ট্রেশনের নকল নিয়েছ?'

'নিয়েছি। এই যে।'

দেখলেন, ঠিকই আছে। পিতা হিসেবে ভাস্করেরই নাম আছে। তারিখও ঠিকঠাক। কিন্তু ছেলের নাম গোপাল রেখেছ বুঝি? হ্যাঁ, মায়ের প্রিয়তম নাম গোপাল। আমাদের অসীম নামটাই পছন্দ। তা বেশ তো, অসীম পোশাকি থাকবে, গোপাল ডাক-নাম।

'তোমার ব্যাঙ্কে তোমার নামে বাকি পাঁচ হাজার টাকার চেক

পাঠিয়ে দিয়েছি।' বললেন জগৎপতিঃ 'এবার তবে ডিভোর্সের মামলাটা ফাইল করে দিই।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'আমি একটা আর্জি তৈরি করে দেব সেটা সই করে দেবে।'

'শুধু এইটুকু?' পরম আশ্বাসে বললে ভাস্কর।

'হ্যাঁ। আর বিয়ের পরেই তাড়াতাড়ি হচ্ছে বলে একটা স্পেশাল কেস করতে হবে। সে সব আমি দেখে নেব।'

'আর কিছুই আমাকে করতে হবে না?'

'সময়কালে একটা এক্সপার্টি এভিডেন্স দিতে হবে। ব্যস, শান্তি।'

'আর্জিটা এনেছেন?' যেন এখুনিই সই করে দেবে হাত বাড়াল ভাস্কর।

'না, দিন-কতক পরে তুমি আমাদের বাড়ি যেও, সই করিয়ে নেব। ব্যাঙ্কে খোঁজ কোরো, টাকাটা ঠিক ক্রেডিট হল কিনা।' আশীর্বাদে ভরপুর হয়ে জগৎপতি বাড়ি ফিরলেন।

কদিন পরে সকালবেলা ট্যাক্সি নিয়ে জগৎপতির বাড়ির দরজায় এসে থামল ভাস্কর। ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঢুকল ভিতরে। ডাকাত-পড়ার মত ঢুকল রুচিরার ঘরে। রুচিরা ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে।

অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে রুচিরাকে। ভাঙা-ভাঙা শরীরটা আঁকাবাঁকা সুরের মতই মনোহর। কিন্তু, না, বিভ্রান্ত হবে না, বাস্তব-ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজে সে পরখ করে নেবে।

'চলুন, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।' ভাস্কর যেন ঘোড়ায় চড়ে এসেছেঃ 'উঠুন, চট করে তৈরি হয়ে নিন। ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে।'

'কোথায় যেতে হবে?' চোখ তুলল রুচিরা।

'আমার বাড়ি।'

'সেখানে কী ?'

'সেখানে কী জানি না। তবু আপনাকে যেতে হবে। যেতেই হবে।'

'তার আগে বিচ্ছেদের মামলার আর্জিটা সই করেছেন ?'

'না, করিনি। কিন্তু, কাকে আমি বিচ্ছেদ করব ?'

'কাকে, জানেন না ? আমাকে।'

'মামলা স্ত্রী-বিচ্ছেদের। কিন্তু আপনি কি আমার স্ত্রী ?'

'আমি কে তবে ?' হাঁপধরা লোকের মত মুখ করল রুচিরা।

'আপনি একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ওঠে কী করে ?'

'ভদ্রমহিলা ?'

'ভদ্রমহিলা বলেই তো 'আপনি' করে বলছি। স্ত্রী হলে তো তুমি বলতাম।' নিজের থেকেই ভাস্কর বসল সামনের চেয়ারে। বললে, 'তাই যদি সত্যিই বিচ্ছেদ চান তা হলে আপনাকে পুরোপুরি স্ত্রী হতে হবে। আমার সংসার করতে হবে।'

গোপালকে শুইয়ে রাখল বিছানায়। বেশেবাসে নির্ভেজাল পারিপাট্য আনল। যত পারল বিষ ঢালল কণ্ঠে। রুচিরা বললে, 'বাকি টাকাটা পেয়ে গিয়েছেন বুঝি ?'

'টাকা পাবার কথা—পাব না কেন ?'

'তবে আর কী চান ? চাকরিও তো একটা বাগিয়েছেন জুৎসই। আসবাবওয়ালা ফ্ল্যাটও। যে শুধু টাকার কাঙাল তার আর কী দরকার ?'

'টাকার কাঙাল ?'

'টাকার দামে পরোপকার করতে এসেছেন!' আগুনের মত হয়ে উঠে পড়ল রুচিরা: 'আমি তো ভদ্রমহিলা, আপনি তবে কেন ভদ্রলোক হতে পারছেন না ? আর সকলের দাম আছে, নিজের

কথার কেন দাম নেই? ব্লেকমেল করতে এসেছেন? অভদ্র কোথাকার!'

'এখন তেজ দেখানো খুবই সহজ।' ভাস্করও জিভকে ঘৃণার পাষাণে শান দিয়ে নিল: 'এখন যে বৈধতায় আচ্ছাদিত হয়েছেন! নিশ্চিন্ত হয়েছেন! এখন আমিইও তো অভদ্র। আর আপনি—'

কী একটা কঠিন কুৎসিত কথা বলবে অনুমান করে দু কান দু হাতে চাপা দিল রুচিরা।

কিন্তু, শুনুক বা না শুনুক, থামল না ভাস্কর। বললে, 'আর আপনি সতীশক্তির প্রতিমূর্তি। শুনুন, বাপের বাড়িতে মজাসে বসে থেকে আপনি মুক্তি পাবেন না। আপনাকে মুক্তি নিতে হবে আমার ঘর থেকে, আমার বন্ধন থেকে।'

'কিন্তু আপনার ঘরে যে আমি যাব সেখানে আমার কিসের আকর্ষণ?' রুচিরা প্রায় হাহাকার করে উঠল: 'আমি কি আপনাকে কোনো দিন চেয়েছি? কোনো দিন ভালোবেসেছি একফোঁটা?'

'ভালোবাসার কথা বলবেন না। আর চাওয়া? যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই।' ক্রোধ ছেড়ে দৃঢ়তায় নেমে এল ভাস্কর: 'ভালোবাসা ছাড়া স্বচ্ছন্দেই বহু স্বামী-স্ত্রী সংসার করে যাচ্ছে। এতটুকু বাধছে না। ইচ্ছে করলে আপনিও পারবেন।'

'ইচ্ছে? আমার ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে হয় না একফোঁটা। আপনার কী আছে যে হবে?'

'কী আছে?' ভাস্কর উঠে দাঁড়াল: 'দুখানি কাগজ আছে। স্বামিত্বের ইস্তাহার আর পিতৃত্বের সার্টিফিকেট।'

'যে দু টুকরো কাগজে সেই ঘোষণা করা আছে তার দাম ঐ দু টুকরো কাগজেরও সমান নয়। সমস্তই অলীক, অসার। সে আপনিও জানেন, আমিও জানি।'

'আমার-আপনার জানায় না-জানায় কিছু এসে যাবে না। আইন কী জানে তাই দেখতে হবে।'

'খুব আইনজ্ঞান হয়েছে আপনার!'

'আমাদের কী করে হবে? সমস্ত আইনজ্ঞান আপনার আর আপনার বাবার!'

'ছোটলোক কোথাকার! ভেবেছিলাম কিছু মর্যাদা আছে আপনার, কিছু মহত্ত্ব। কিছু নেই। আপনার আছে শুধু টাকার খাঁকতি, কী করে আরো দুটো টাকা হবে। আরো যদি কিছু দরকার হয়, যান না বাবার কাছে, গিয়ে হাত পাতুন।'

'কে কার কাছে হাত পাতে দেখা যাবে।'

'আমরা হাত পাতি না, আমারা হাত বাড়াই। সে হাত স্বত্বের হাত, সত্যের হাত, আপনার মত গরিব ক্ষুদ্রাত্মা ভিক্ষুকের হাত নয়।'

'তবে তাই। আপনি তা হলে যাবেন না আমার সঙ্গে?' খাটের দিকে দু পা এগুলো ভাস্কর।

'ককখনো না।' রুচিরা খাটের বাজু ধরল।

'বেশ, যাবেন না। কিন্তু আমি ছেলেকে নিয়ে যাই।' বলে মুহূর্তের মধ্যে ভাস্কর ছেলেকে খাট থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে কাঁথায়-ন্যাকড়ায় বুকের মধ্যে পুঁটলি করে চেপে ধরে চলল সিঁড়ির দিকে।

একেবারেই প্রস্তুত ছিল না রুচিরা। প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, পরে হৃৎপিণ্ডে হেঁচকা টান পড়তেই যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল: 'ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'আমার বাড়িতে।'

সিঁড়ির কাছাকাছি রুচিরাও এসে পড়েছে। বললে, 'সে কী, ও কি আপনার ছেলে?'

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে নামতে-নামতে হেসে উঠল ভাস্কর। বললে, 'কার ছেলে তা কোর্টকে, আইনকে গিয়ে জিগগেস করুন।'

খুব একটা চেঁচামিচি করতে গলায় বুঝি আটকাল রুচিরার। প্রথমত, নাটকীয়তার প্রতি অরুচি, দ্বিতীয়ত এণাক্ষীর বাড়াবাড়ি অসুখ চলেছে কদিন। তেমন চেঁচামেচি করলে এণাক্ষী নিশ্চয়ই উত্তেজিত হবে, হয়তো বা ছুটে আসবে, হার্টের অবস্থা যা শোচনীয়, একটা কিছু ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়। আর তৃতীয়ত, মনের গভীর স্তরে আছে বোধহয় শীতলতা—যাক নিয়ে, নিয়ে গেলে বাঁচি—এই নির্লক্ষ্য উপশম।

তবু জান্তব আসক্তিতে নেমে এল নিচে: আর বুঝি নাগাল পেল না। সিঁড়ির প্রথম ধাপের উপর বিধ্বস্তের মত বসে পড়ল রুচিরা। একবার কেঁদে উঠল, 'বাবা' বলে—জগৎপতির উদ্দেশে।

জগৎপতি বৈঠকখানায় কাজ করছিলেন, ত্রস্ত পায়ে ছুটে এলেন। এণাক্ষীর কিছু হল নাকি? দেখলেন প্যাসেজ দিয়ে কে বেরিয়ে গেল ভাস্করের মত। বাইরে এসে নিশ্চিত হলেন, ভাস্করই তো, রাস্তায় দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠছে।

'শোনো।' জগৎপতি ট্যাক্সিকে উদ্দেশ করলেন।

হতচকিতের মত ড্রাইভার দাঁড়িয়ে গেল।

রাস্তায় চলে এসে জগৎপতি দাঁড়ালেন ট্যাক্সি ঘেঁসে। বললেন, 'তুমি কখন এলে টের পাইনি। এখুনি চলে যাচ্ছ কী। নেমে এস। আর্জিটা তৈরি হয়েছে। সই করে দিয়ে যাও।'

'সই করব না।'

'সে কী, সই করবে না মানে?'

'সই করব না মানে সই করব না।' ভাস্কর ট্যাক্সিকে হুকুম দিল: 'চলো।'

ট্যাক্সির স্টার্টের আওয়াজ ছাপিয়ে ভাস্করের পুঁটলির মধ্যে থেকে একটা কচি কান্নার শব্দ উঠল।

'ও কে? ও কে তোমার ওখানে?' জগৎপতি স্তম্ভিতের মত হয়ে গেলেন।

'ও আমার ছেলে।'

'তোমার ছেলে?'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে। ওকে এই পাপপুরী থেকে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'আমার ওখানে। আমারই ওকে মানুষ করবার কথা।'

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

১৪

মহালয়ার কোলে শিশুকে ঢেলে দিয়ে ভাস্কর বললে, 'এই নাও তোমার গোপাল।'

'নিয়ে এসেছিস ? পেরেছিস আনতে ?' আতঙ্কে-আনন্দে মেশানো চেহারায় মহালয়া জাপটে ধরলেন, আঁকড়ে রইলেন গোপালকে।

'কেন পারব না ?' ভাস্কর প্রায় বীরের মত বললে, 'মা নষ্ট বলে ছেলেকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। দেখ এখন পারো কিনা বাঁচিয়ে রাখতে।'

কী যে বলিস। মহালয়া একেবারে বুক দিয়ে পড়লেন। আঁতুড়ে মা মরে গেলে ছেলে কি আর বাঁচে না ? খুব বাঁচে। দেখে এসেছেন মা বুকের দুধ খরচ করতে অনিচ্ছুক, তাই বোতলে টিনের দুধ খাচ্ছে ছেলে। তাই যদি হয়, মাকে আর তবে কিসের প্রয়োজন ? বোতল আর টিনের দুধ মহালয়াও জোগাড় করতে পারে। এনে দিতে পারে দোলনা, ফানুস, ঝুমঝুমি, বিছানা-বালিশ, এনে দিতে পারে রঙিন মশারি। ডাক্তার ডাকতেও অপারগ নয় মহালয়া। যে সমস্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তার কিছুরই অভাব হবে না।

কতক্ষণ কাঁদবে গোপাল! এই আবার হাসতে সুরু করেছে। হাত-পা ছুঁড়ে খেলতে সুরু করেছে। ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলেই খুঁজতে শিখেছে ঠাকুমাকে। ভাস্করকেও চিনতে শিখেছে। সোমনাথও যদি হাত বাড়িয়ে দেয় কোলে উঠতে আপত্তি করে না।

তবু ভয়ে-ভয়ে আছে মহালয়া। ডাকাতি করে এমনি ছেলে নিয়ে আসা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না জগৎপতি। এত বড় একজন জবরদস্ত ধনীমানী সহ্য করবেন না এ অপমান। মেয়ের মনোভাবে যুক্তি থাক বা না থাক, পিতৃস্নেহ স্বভাবতই মেয়ের পক্ষ নেবে। কিছুতেই মেয়েকে পরাভূত দেখতে চাইবে না। শূন্যকোলে

রিক্তবুকে মেয়েকে শোকার্ত মুখে সংসারে ঘুরতে ফিরতে দেখবে, সব থেকেও যার কিছু নেই, এ বাপের পক্ষে অমানুষিক যন্ত্রণা। প্রতিকার আসবেই আসবে।

কিন্তু কী প্রতিকার? পুলিশ নিয়ে আসবে? ভাস্কর বললে, বাপ তার ছেলে নিয়ে এসেছে এর মধ্যে দুরভিসন্ধি কোথায়? না, ফৌজদারির নামগন্ধও নেই। এক করতে পারে কোর্টে গিয়ে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানাতে পারে। বলতে পারে, দুধের শিশু, মার হেপাজতেই তার থাকা উচিত। শিশুর মঙ্গল দেখতে হলে, এক্ষেত্রে, মা-ই উপযুক্ত অভিভাবক, বাপ নয়। সুতরাং মার কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক শিশুকে।

বেশ তো, যাক না কোর্টে, করুক না দরখাস্ত। সমগ্র কথাটা উঠে পড়ুক। কাপট্যের যবনিকা ছিঁড়েখুঁড়ে খানখান হয়ে যাক।

কিন্তু কই, দশ-বারো দিন হয়ে গেল, ও পক্ষের কোনোই উচ্চবাচ্য নেই। কোথায় কোর্ট-পুলিশ! সামান্য একটা কেউ খোঁজ করতে পর্যন্ত এল না।

না, আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। এবার বুঝবে রুচিরা, এ বাড়িতে সত্যিই তার কোনো আকর্ষণ আছে কিনা। আর এ টান, যেমন তেমন নয়, একেবারে নাড়ীর টান, গভীরের কান্না। একেবারে মূল ধরে উপড়ে আনা।

এ শিশুই টেনে আনবে রুচিরাকে। যেখান থেকেই আসুক সন্তান সন্তান। তার কাছে কিসের লজ্জা কিসের অহঙ্কার। ধৈর্য ধরো, আসবেই আসবে। প্রত্যাখ্যানের এক স্তূপ পাথর স্নিগ্ধগাত্রী নির্ঝরিণী হয়ে যাবে। যদি কারু ক্ষমতা থেকে থাকে তবে এই এক শিশুরই আছে।

কদিন পরে একটা শুধু ফোন এল আপিসে। হ্যাঁ, জগৎপতির গলা।

'কি, কী হল? কী ঠিক করলে?'

'কোন বিষয়ে ?'

'ডিভোর্স বিষয়ে। সে কী, মনে করতে পারছ না ?'

'না, তা কেন ?'

'তবে ? কী বলতে চাচ্ছ ?'

'বলতে চাচ্ছি যার ডিভোর্স তিনি নিজে এসে নিয়ে যাবেন।' রিসিভার রেখে দিল ভাস্কর।

তারপর সটান ভাস্করের আপিসে চলে এলেন জগৎপতি। বাড়িতে যেতে পা উঠল না। যদি তাড়িয়ে দেয় তা হলে কী করে কোন মুখে ফিরে আসবেন ?

আপিসে ধরাই সোজা। আপিসের পরিবেশই যথাযোগ্য গাম্ভীর্য আনবে।

ম্যানেজার নিভৃত দর্শনের ব্যবস্থা করে দিল। ভাস্করের মুখোমুখি বসলেন জগৎপতি।

'আমি সেই আর্জিটা নিয়ে এসেছি, কোর্ট-ফি চড়িয়ে। একবার কি পড়ে দেখবে ?' জগৎপতি ব্যাগ খুলে হাত ঢোকালেন।

'না। পড়বার দরকার নেই।' ভাস্কর বললে।

'তা হলে দস্তখৎ করে দাও।'

'বলেছি তো দস্তখৎ আমি করব না।'

'করবে না ?'

'মানে এখন করব না।'

'কখন করবে ?'

'চুক্তির সমস্ত সর্ত যখন পরিপূর্ণ হবে।' ভাস্কর পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত মুখে বললে।

'চুক্তির আর কী সর্ত ? উঁচু চাকরি আর নগদ টাকা। ফ্ল্যাট যে ভাড়া করে দিয়েছি সেটা বাড়তি, অতিরিক্ত। এর বেশি আর কিছু ছিল না।'

'ছিল। সে সর্ত রুচিরার সঙ্গে।'

'মিথ্যে কথা।' জগৎপতি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : 'চুক্তির মধ্যে পক্ষ শুধু আমি আর তুমি। রুচিরা আসতেই পারে না। রুচিরার সঙ্গে তোমার দেখা হল কখন ? চুক্তি হয়ে যাবার পর।'

'চুক্তিটা কন্টিনু করছিল, কনক্লুডেড হয়নি। কাগজে-কলমে লেখা হয়নি তো, তাই ধরা যাচ্ছে না। আপনি রুচিরাকে জিগগেস করে দেখবেন।'

তর্ক করা অসম্ভব। কণ্ঠে মিনতি মাখালেন জগৎপতি। বললেন, 'কেন আর ঝামেলা বাড়াচ্ছ ? বলো আর কত টাকা চাই। চেক-বই আমার সঙ্গেই আছে। আমি একদিকে চেক কাটি তুমি অন্যদিকে আর্জি সই করো। দুটো একসঙ্গেই হয়ে যাক।'

'টাকা ?' মুখে তেতো-তেতো ভাব করল ভাস্কর : 'টাকার কথা রুচিরাও বলেছিল। আমাকে বলেছিল গরিব, ভিক্ষুক, বলেছিল ব্ল্যাকমেলার। আমি রাজি হইনি ! কেননা টাকার চেয়ে মান বড়।'

'মান বড় ? কিসের মান ?'

'স্বামিত্বের মান।'

এর পরে আর কোন কথা বলা চলে ? জগৎপতি তখন অন্য মূর্তি ধরতে চাইলেন। বললেন, 'তুমি যদি কথা না রাখো, পরিণাম কী হবে ভাবতে পারো ?'

'পারি। কিন্তু কথা আমি রাখব না আপনাকে কে বললে ?'

'কোথায় রাখছ ?' অস্থির হয়ে মাঝখানের টেবিলে কিল বসালেন জগৎপতি : 'আর্জিতে সই দিচ্ছ কই ?'

'কোনো টাইম-লিমিট নেই।'

'নেই মানে ? বলা ছিল বিয়ের দু-এক বছর পরে।'

'তার মানেই একটা ভদ্র, যাকে বলে ফেয়ার টাইম, ছেড়ে দিয়ে। ততদিন একটু অপেক্ষা করতে দোষ কী।'

'তোমার কী মতলব তা আমি বুঝেছি। স্কাউণ্ড্রেল—'

'কে কাকে বলছে!' অনুকম্পার হাসি হাসল ভাস্কর।

ঝট করে উঠে পড়লেন জগৎপতি। বললেন, 'দেখি আর কী উপায় আছে।'

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল ভাস্কর। মহালয়াকে বললে সব কথা। বললে, 'সঙ্গে লোক দিচ্ছি, তুমি গোপালকে নিয়ে আজ রাত্রেই বড় মাসিমার কাছে কাশী চলে যাও।'

'আর তোরা?'

'আমরা থাকব। আমার আপিস, সোমনাথের ইস্কুল। আমাদের জন্যে ভাবনা কোরো না। মর্তের এক অসহায় গোপালকে রক্ষা করেছি বলে ব্রহ্মাণ্ডের গোপাল আমাদের রক্ষা করবেন।'

মহালয়া তৈরি হতে লাগল।

'মর্তের এই গোপালের জন্যেই আমার বেশি ভয়। হামলা করে ওকে না একদিন ছিনিয়ে নেয় তোমার বুক থেকে।' বলতে লাগল ভাস্কর: 'তুমি ভাবতে পারো মা, বুড়ো ঠাকুরদা একবারও নাতির কথা জিজ্ঞেস করলে না? ঠাকুরদাকে ছেড়ে দি, ওর মার জুড়ি নেই। যে বাড়িতে ওর ছেলে আছে, পেটের ছেলে, সে বাড়িও ওর আকর্ষণীয় নয়। আজকালকার মা-রাও বদলে গিয়েছে, মডার্ন হয়েছে। আজকাল কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতাও কম নয়। মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা হলে, আজকালকার মা-রা মামলা ছেড়ে দেয় না, বুকে বসে দাড়ি ওপড়ায়, তারপর ছেলেকে হারিয়ে ছাড়ে। নইলে ভাবতে পারো, ছেলেটাকে একদিন একটু দেখতেও আসে না? মনে হয় ছেলেটাকে যে নিয়ে এসেছি এতে ওর আরাম হয়েছে, ফুর্তি হয়েছে—'

'আমি বলি কী, তুই তোর ছেলে পেয়েছিস, বউকে তুই ছেড়ে দে।' মহালয়া বললে, 'যার এখানে মন নেই, যে অন্য রকম, তাকে জোর করে ধরে বেঁধে রেখে শান্তি নেই। ধরে বেঁধে রাখতে পারবিওনে।'

'আমার মনে হয় লুকিয়ে-লুকিয়ে ও ছেলের খোঁজ নেয়।' আত্ম-তৃপ্তের মত বললে ভাস্কর: 'আর যখন বোঝে ছেলে ভালো আছে তখন আলস্যে হাই তোলে। এখন ছেলেকে দূরে সরিয়ে দিলে এ বাড়ির শূন্যতা যদি আকর্ষণীয় হয়।' এবার বুঝি আপন মনেই কথা বলে উঠল: 'ও যে অন্যরকম তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু ওর অহঙ্কার চূর্ণ হবার আগে ও ছাড়া পাবে এ হতে পারে না। এ কোনো দিন হয়নি পৃথিবীতে।'

রাত্রের ট্রেনে মহালয়া গোপালকে নিয়ে কাশী রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে যে চলনদার বোনপোটি আছে সে কাশীর সব অন্ধি-সন্ধি জানে, কোনো ভয়-ভাবনার কিছু নেই।

গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো, মহালয়া বললে ভাস্করকে, 'বউ যদি রাজি হয় আমাকে খবর দিস।'

'রাজি হল না, কিছুতেই না।' একটা স্তব্ধীভূত হাহাকারের চেহারায় জগৎপতি তাঁর শোবার ঘরের সোফায় ভেঙে পড়লেন।

এণাক্ষী বিছানায় শোয়া, ওঠবার চেষ্টা করেও পারল না উঠতে। বললে, 'আরো কিছু টাকা পেলেও না?'

'না।' জগৎপতি তারপর গালাগাল দিতে লাগলেন। একেই বলে মোকদ্দমার হার। হেরে গেলে গালাগাল দেওয়া। এমন হার জগৎপতি হারেননি জীবনে।

রুচিরা সামনেই দাঁড়িয়েছিল, তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি পারলাম না। তুমি এখন নিজে দেখ। নিজের পথ নিজে খুঁজে নাও।'

'তাই হবে।' রুচিরা সহজ স্বচ্ছ হবার চেষ্টা করল: 'তাতে ভাববার কী আছে!'

'কিন্তু তুমিও যে পারবে এমন মনে হয় না।' পরাভূতের মত শূন্যচোখে তাকিয়ে জগৎপতি বললেন, 'শেষ পর্যন্ত যদি তোমাকে ঐ নামটার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতে হয় মরেও শান্তি পাব না।'

পারলেন না বসে থাকতে, উঠে পড়লেন। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, আবার ফিরে এলেন। বললেন, 'আসলে আমার লোকনির্বাচনেই ভুল হয়েছিল।

ক্রূর চোখে তাকাল এণাক্ষী।

সে দৃষ্টির সাক্ষাৎ হবার সাহস নেই জগৎপতির। তবু বলবার কথাটা বলতে আর বাধা কী। তাই বললেন, 'লোকটা আসলে গরিব। লোভী।'

তত রাগে নয় যত ঘৃণায় জ্বলতে লাগলেন জগৎপতি। কুটিল মনের গহনে চিন্তার জট পাকাতে লাগলেন। প্রতিকার নেই প্রতিশোধ নেই।

কিন্তু নিমেষে সমস্ত বানচাল হয়ে গেল।

সেই রাতেই আবার নতুন স্ট্রোক হল এণাক্ষীর। আর দু দিন দু রাতের বিপুল সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিয়ে সে চোখ বুজল।

আবার হার খেলেন জগৎপতি।

মনে হল আদিগন্ত সমস্ত সংসার শাদা হয়ে গিয়েছে। কোথাও আর স্বপ্নের রঙ নেই, আশার রেখা নেই—সমস্তই ভোজবাজি, সমস্তটাই প্রবঞ্চনা। বাড়ি-ঘর মিথ্যে, টাকা-পয়সা মিথ্যে, নাম-যশ পদবী-প্রতিপত্তি সমস্ত। তরুণ সমিতি, মন্ত্রীত্ব, শক্তির মদিরা সমস্ত অবস্তু। গন্ধর্বনগরে এসে আকাশকুসুম চয়ন করা।

একমাত্র সত্য বুঝি এই কান্না। ভাগ্যের রুদ্ধ-স্তব্ধ লোহার দরজায় কপাল কোটা।

জগৎপতির কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছে রুচিরা। মেয়ের মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন জগৎপতি। বলছেন, 'তুই ভেঙে পড়ছিস কেন? কত পথ তোর সামনে এখনো পড়ে আছে। তুই এগিয়ে যাবি। যে পড়ে ওঠে সেই-ই তো বাহাদুর। সমস্ত ভুলের বাইরেও ভালো আছে। তুই সেইখানে গিয়ে দাঁড়াবি। তুই থামবি কেন?

আমিই আর পারব না উঠতে। আমারই আর ভবিষ্যৎ নেই।'

রুচিরাই তখন বাবাকে সান্ত্বনা দিতে বসল। কিন্তু কী সান্ত্বনা দেবে ভাষা খুঁজে পেল না।

তবু সান্ত্বনা আছে। পথ চলার সান্ত্বনা। পথের যে শেষ নেই এই-ই তো অনন্ত সান্ত্বনা। অনন্ত সামর্থ্য।

তাই লঘু পায়ে পথ চলতে-চলতে রুচিরা সিঁড়ি বেয়ে হঠাৎ একদিন এক সন্ধেয় দোতলায় উঠে এল। বাড়িটা কেমন ঘুমো-ঘুমো নিঝুম মনে হচ্ছে। না, কোণের ঘরটাতে পড়ছে সোমনাথ। ও দিকে বুঝি রান্নার ব্যবস্থা। কানে আসছে রান্নার ছ্যাঁকছোঁক। আর সব কোথায়?

সোমনাথের ঘরের দরজার ওপারে এস দাঁড়াল রুচিরা।

'কে?' চমকে উঠল সোমনাথ।

'আমি। চিনতে পাচ্ছ না?'

কী করে চিনবে। কত দিন হয়ে গেল সেই এক দিন দেখেছিল। এত দিনে চেহারাও বদলে গিয়েছে অনেক।

'না। বলুন না কে?'

'আমি—আমি গোপালের মা।'

তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল সোমনাথ। বললে, 'আপনি—তুমি, বৌদি?'

'হ্যাঁ। বাড়িঘর খালি দেখছি যে, গোপাল কোথায়?'

'মার সঙ্গে কাশী গিয়েছে।'

'একেবারে ছেলেবেলা থেকেই তীর্থযাত্রা।' হাসতে চেষ্টা করল রুচিরা: 'তোমার দাদা কোথায়?'

'অফিস থেকে এসে কোথায় একটু বেরিয়েছেন, এক্ষুনি এসে পড়বেন। আপনি আসুন, দাদার ঘরে এসে বসবেন।'

খাটে চেয়ারে টেবিলে আলমারিতে দাদার ঘর। পর্দা কার্পেটও

ছিল বলে শুনেছিল, তা এখন বেপাত্তা। চারদিকে তাকাল রুচিরা, কিছু আকর্ষণীয় আছে কিনা। একটা বই নেই, ম্যাগাজিন নেই, টেবিলে নেই কোনো লেখার সরঞ্জাম। ধুলোমাখা একট ফুলদানি আছে, ফুলের চিহ্নলেশ নেই। দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নেই। আগাগোড়া চিত্তদারিদ্র্যের রুক্ষতা।

কতক্ষণ পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হল। সোমনাথ গিয়ে বসল তার টেবিলে।

শান্ত স্থির মুখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে রুচিরা। অবিশ্বাসী চোখকে শাসন করবার আগেই চিনে ফেলল ভাস্কর। বলে উঠল, 'এ কী, আপনি? কী ব্যাপার?'

'মা মারা গিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, সে তো অনেক দিন হল। শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন না করলেও কানে এসেছে।'

'এবার আবার বাবা পড়েছেন। ডাক্তার যত বলছেন কিছু নয়, বাবা তত ঘাবড়াচ্ছেন, তত কাহিল হচ্ছেন। শুনলে বিশ্বাস করবেন? কোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। উকিল কোর্টে যাওয়া বন্ধ করেছেন মানেই বুঝতে পেরেছেন তার ইতির রেখা ঘনিয়ে এসেছে।'

'আপনি কী করছেন?'

'আমি? আমি পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' উদাসের মত বললে রুচিরা।

'তাই বুঝি এসেছেন পথ ভুলে?'

রুচিরা শীর্ণ মুখে হাসল। বললে, 'পথ ভোলার পরেও যে পথ আছে তাই খুঁজতে।'

অনন্য মনে ভাস্কর সমগ্র করে দেখল রুচিরাকে। কেমন টুল-টুল করছে মুখখানি। ঝুরো ঝুরো কয়েক গুচ্ছ রুখু চুল কপালের এখানে-ওখানে নেমে আরো করুণ করে রেখেছে। গলায় হার নেই

বলে কণ্ঠা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই স্পষ্টতা ঢাকবার জন্যে গলার কাছে আঁচল টানছে বারে বারে। হাত দুখানি তেমনি খালি, কিন্তু আজ বুঝি তাতে দৃঢ়তার নয়, রিক্ততার উল্লেখ। তার পরনের সিল্কের শাড়িটা আজ যেন ঔদ্ধত্যকে নয় দারিদ্র্যকে ব্যক্ত করছে।

'আজ এ বাড়িতে আসবার আপনার আকর্ষণ কী হল ?' কথার সুরে ব্যঙ্গ আনতে গিয়ে আনতে পারল না ভাস্কর, কেমন যেন করুণায় মিশে গেল ঃ 'আপনার অসীমও তো এখানে নেই।'

'ছেলের জন্যে হলে তো কত আগেই আসতাম। ও আপনাদের কাছে আছে তাইতে আমি নিশ্চিন্ত।'

'তবে আর এ বাড়িতে আপনার আকর্ষণ কী ?'

রুচিরা ভাস্করের চোখের উপর চোখ ফেলল। ধীরে বললে, 'আমার একমাত্র আকর্ষণ তুমি।'

'আমি ?' আশিরপদনখ শিউরে উঠল ভাস্কর।

'হ্যাঁ, তুমি, তোমার মহত্ত্ব। তোমার মহত্ত্বই আমার একমাত্র আকর্ষণ, একমাত্র আশ্রয়।' রুচিরার কথায় বুঝি কান্নার আমেজ লাগল কিন্তু শোনাল আনন্দের মত ঃ 'একদিন তুমিই এগিয়ে এসেছিলে, বন্দিনীকে উদ্ধার করতে। সেদিন তুমি ছাড়া আমার আর কেউ বন্ধু ছিল না।'

'আর আজ ?'

'আজও তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। তোমার দৃপ্ত যৌবন, দীপ্ত চরিত্রই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য।'

'অত কথার কী দরকার ?' ক্লান্ত মুখে হাসল ভাস্কর ঃ 'বলো কী করতে হবে ? সেই তৈরি আর্জিটাতে সই করতে হবে ?'

'হ্যাঁ, তাই। আরো প্রমাণ করতে হবে তুমি দরিদ্র নও, ক্ষুদ্রাত্মা নও, লালসাই তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে না—'

'লালসা!' চোখের দৃষ্টি স্নেহে ভিজিয়ে রুচিরার গায়ের উপর রাখল ভাস্কর।

'একশোবার নয়। তুমি আধুনিক যৌবনকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবে। মহৎ বলে প্রতিপন্ন করবে।' কথার ছটায় ঝলমল করে উঠল রুচিরা ঃ 'অর্থের অনটন দারিদ্র্যে নয়, চিত্তের কার্পণ্যই দারিদ্র্য।'

'সংক্ষেপে বলো না তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

'কী এসে যায় একটা দুঃখিনী বন্দিনী মেয়েকে ছেড়ে দিলে?' মিনতিভরা চোখ তুলল রুচিরা।

'তা তো দিলাম। কিন্তু আমার কী হবে?'

'তোমার কী হবে মানে?' রুচিরা যেন কাঠ হয়ে গেল।

'আমি তবে কী নিয়ে থাকব? তুমি একদিন আসবে এই আশাটা ছাড়তে পাচ্ছি কই? বলতে কী, এই আশা নিয়েই তো বসে আছি। শোনো মজার কথা। তার আগে তোমাকে একটু চা করে দিতে বলি।' বলে উঠে পড়ল।

'না, না, চায়ের দরকার নেই।'

'চা আমারও জন্যে। নর্ম্যালি চা-টা তোমারই করে দেবার কথা। তা যখন হবার নয় তখন ঠাকুরকে বলা ভালো।' তাই বললে ভাস্কর। পরে আবার চেয়ারে এসে বসল। বললে, 'মজার কথাটা হচ্ছে, আপিস থেকে নোটিশ দিয়েছে, চাকরিটা ছাঁট হয়ে যাবে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, তিন মাসের নোটিশ। সুতরাং, আমি বলতে পারি যেহেতু চাকরিটা থাকছে না, ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে, সেই হেতু আমি রাখব না প্রতিজ্ঞা।'

'না, না, তুমি তা বলবে না।'

'বলব না। কেননা চাকুরি চলে যায়, আবার চাকরি পাব। কিন্তু তুমি চলে গেলে তোমাকে পাব কোথায়!'

'ছি ছি, আমি একটা কী!' নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে চাইল রুচিরা : 'আমি বাজে, পচা, কুচ্ছিত।'

সরল শিশুর মত শব্দ করে হেসে উঠল ভাস্কর। বললে, 'মেয়ে যখন পুরুষকে ভালোবাসে তখন মনে-মনে কিছু-না-কিছু সে হিসেব করে, রূপবান কিনা, ধনবান কিনা, বিদ্বান কিনা, সুবিধেজনক কিনা—কিন্তু পুরুষ যখন ভালোবাসে তখন সে চিন্তা করে না। মেয়ে পচা কিনা, সধবা না বিধবা, দ্বিচারিণী না কলঙ্কি
বিচারও তার হিসেবের বাইরে।'

'এ সমস্তই কথার কথা।' রুচিরা একটু বুঝি কঠিন হ
এক্ষেত্রে ভালোবাসার কথা ওঠে কী করে?'

ভাস্কর হাসল : 'উঠে পড়লে কী করা যাবে? আর ভালোবাসা কখন জাগে কেউ বলতে পারে না, আর যদি একবার জাগে তা হলে কি তুমি আর তাকে লালসা বলতে পারো?'

রুচিরার গা কেমন ছমছম করে উঠল। বললে, 'কিন্তু যখন আপনি বাবার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন তখন তো আলাপ হওয়া দূরে থাক, আমাকে দেখেনইনি মুখোমুখি।'

'তোমার কী বুদ্ধি! যেন না দেখে না জেনে ভালোবাসা যায় না। যদি না-ও যায়, পরে জাগতে দোষ কী! যখন তোমাকে পরে দেখলাম, পরে আলাপ হল—তখন?'

'কিন্তু ভালোবাসা তো আমারো মধ্যে জাগা দরকার!' রুচিরার গলায় ঝাঁজ ফুটল।

'নিশ্চয়। তারই জন্যে তো ঐ সর্তটা যোগ করেছিলাম। আর তুমি তা হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলে।'

'বা, আমি আবার কোন সর্ত মেনে নিয়েছিলাম?' প্রায় লাফিয়ে উঠল রুচিরা।

ঠাকুর দুই হাতে করে দুই পেয়ালা চা এনে রাখল টেবিলে।

ভাস্কর বললে, 'সার্ভিসটা ভালো হল না। চা-টা খাও, বলছি।'

'না, তুমি আগে বলো।'

'ভয় নেই। চায়ে কোনো তুক করিনি যে চুমুক দিলেই তোমার ভালোবাসা জাগবে। যদিও সর্তটা সেই রকম ছিল। মনে নেই ?'

নিচু হয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল রুচিরা।

'কথা ছিল ইতিমধ্যে তুমি আমাকে একটা চান্স দেবে তোমার মধ্যে ভালোবাসা জাগাতে পারি কিনা। শুকনো কাঠে ফুল ফোটাতে পারি কিনা। কথা ছিল আমার সাধনার ফলে তোমার শেষে এও মনে হতে পারে যে এ বিয়ে আর ভেঙে দিয়ে কাজ নেই, যাকে ঘৃণা করব ভেবেছিলাম সেই আমার বরণীয়।'

'তার মানে ভালোবাসা জাগে কিনা তা দেখবার জন্যে তোমার সঙ্গে আমি ঘর করি ? তার মানেই আবার বেড়ি পরি ? কী চমৎকার !' রাগ-রাগ মুখ করল রুচিরা : 'যে সর্তের পূরণ হয় না তা একজন বিপদে পড়ে স্বীকার করলেও কিছু এসে যায় না। অপূরণীয় অপূরণীয়ই থাকে।'

'বা, স্থূল ঘর না করেও তো সে চান্স দেয়া যায়।' কী রকম করে তাকাল ভাস্কর।

'আমি তো তার উপায় দেখি না। শেষকালে আমি যখন ডিভোর্স নিয়ে যাই দেখি আমি আবার বন্দী ? আমি আবার—' রুচিরা ঝট করে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে : 'অসম্ভব।' তারপর বুক ভাঙা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'তা হলে আমি কী বুঝছি ?'

'কী বিষয় ? মহৎ হয়ে যাব কিনা ?' ভাস্করও দাঁড়াল মুখোমুখি। বললে, 'কিন্তু, খালি পেটে কি মহৎ হওয়া চলে ? আর মহৎ হওয়া মানেই তো শাস্তি পাওয়া, চিরকালের মত তোমাকে হারিয়ে ফেলা।'

'তা আর কী করা যাবে ?' এক পা এগুলো রুচিরা। বললে,

'যা পাবার নয় তা কোনোদিনই পাবার নয়। শেকল দিয়ে আটকে রাখলেও নয়। এ কি, দরজা বন্ধ করবে নাকি?'

'না, বন্ধ করব কেন? পাশের ঘরে সোমনাথ পড়ছে। তাছাড়া তুমি স্ত্রী, আজও স্ত্রী, তোমার সম্পর্কে আড়ম্বরের দরকার নেই। তোমার দরজা সব সময়েই খোলা। বলছিলাম কী, আরো একটু বসে যাও।'

'না।' চঞ্চল হয়ে উঠল রুচিরা: 'আমার গাড়ি এসেছে। হর্ন শুনছ না?'

'তা গাড়ি এলেও একটু বসে যাওয়া যায়।'

'অকারণে বসে লাভ কী।'

'বেশ তো আজ তাড়া থাকে, আরেক দিন এস।' ভাস্কর স্থির চোখে তাকাল: 'অন্তত একটা রাত।'

'তা হলে ঐ কথা রইল। আরেকদিন আসব, বেশ, আরেক দিন।

নিজেই নেমে যাচ্ছিল রুচিরা, ভাস্কর তবু এগিয়ে দিতে এল। দেখলে নিচে কে একজন স্যুটপরা ভদ্রলোক গাড়িতে বসে সিগারেট টানছে।

রুচিরাই আলাপ করিয়ে দিল: 'ইনি ভাস্কর আর ইনি এঞ্জিনিয়র অরিন্দম।'

গাড়িতে উঠে অরিন্দমের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিল রুচিরা। ঠিক ধরালো কিনা দেখা গেল না—গাড়ি আগেই স্টার্ট নিয়েছে। তা সিগারেট খেলে কী হয়! রুচিরা যদি সিগারেট খায় তা হলে তো ওকে ভালোই দেখাবে। আকর্ষণীয় দেখাবে।

কিন্তু মদ খেলে?

জানি না।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার চলে এল রুচিরা। কিন্তু আজ তার এ

কী মূর্তি! পা টলছে, চোখ মুখ লালচে। কথাও জড়ানো। আঁচলটা কাঁধের উপর থাকছে না, এলিয়ে পড়ছে।

ঘরে ঢুকেই ব্যাকুল ভঙ্গিতে ভাস্করের হাত জড়িয়ে ধরল। মুখের কাছে মুখ এনে বললে, 'তুমি আমার স্বামী, তুমিই আমাকে বাঁচাবে। তুমিই মুক্ত করে দেবে আমাকে। আমাকে ত্যাগ করেই মুক্ত করে দেবে। তুমি—তুমি। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

'এ কী, তুমি ড্রিঙ্ক করেছ?' ভাস্কর ধীরে সরিয়ে দিল রুচিরাকে।

'বাবার কথায় করেছি। বলেছেন এতেই তোমার কাছে কেস মেড আউট হবে। বলো না, হবে? মাতাল দেখলে ছেড়ে দেবে তুমি?'

'ছি! তুমি শেষকালে এইরকম সুরু করলে?'

'কেন করব না? মুক্তির জন্যে সব কিছু করা যায়—সব কিছু। তা ছাড়া বাবার যা অসুখ হয়েছে উনি আর বেশিদিন নেই। উনি টেঁসে গেলেই সমস্ত বাড়ি-ঘর-টাকা-পয়সা আমার হবে। ষোল আনা আমার। এত সম্পত্তি একটু-আধটু ওড়াব না? না ওড়ালে চলবে কেন? আর পাঁচজনে খাবে কী।' হাসছে, হাসতে গিয়ে কাঁদছে রুচিরা।

ভাস্কর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রুচিরার দিকে। পাপের মধ্যেও উজ্জ্বল, অশোভনের মধ্যেও সুন্দর, এ কে অপরূপ! নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললে, 'যাও, বাড়ি যাও। এখানে এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকাটা উচিত হবে না।'

'আর উচিত!' একস্তূপ ক্লান্তির মত একটা চেয়ারে ভেঙে পড়ল রুচিরা। বললে, 'কিন্তু আমার শুধু-হাতে ফিরে গেলে চলবে না। বলো, আর কী চাই, কতদূর?' উঠে পড়ল রুচিরা, দরজার কাছে গিয়ে খিলে হাত দিল: 'দরজা বন্ধ করে দেব? আলো জ্বলবে?'

'না।' জোরে বলে উঠল ভাস্কর: 'দরজা খোলা থাকবে।'

'খোলা থাকবে ?'

'হ্যাঁ, যে পরাভূত, তার আবার মুক্তি কী!' নিজেই ভাস্কর এগুলো দরজার দিকে। রুচিরার দিকে হাত বাড়াল : 'চলো তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'বাড়িতে ?' রুচিরা অভিভূতের মত ভাস্করকে অনুসরণ করল।

নিচে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছে রুচিরা।

ট্যাক্সিটা ফাঁকা।

বিমর্ষ হয়ে গেল ভাস্কর। যেন সমাজের চেহারা রাতারাতি বদলে গিয়েছে। যেন পুরুষের সন্ধানে উচ্ছৃঙ্খল যুবতী বেরিয়েছে সাময়িক সান্ধ্যবিহারে।

সেই বিয়ের দিন ফিরেছিল এক ট্যাক্সিতে। আজও সেই ব্যবধান, সেই স্তব্ধতা। আজ রুচিরা সম্মত থাকলেও ভাস্কর নিরুদ্যম।

খাঁচার মধ্যে আতঙ্কিত ক্লান্ত পাখির ঝটপটানি এবার শেষ হোক। পরে শ্যামলতা কোথায় কে জানে, এখন আকাশের মুক্ত নীলিমা তো ওকে ডেকে নিক।

রুচিরাদের বাড়িতে এসে রুচিরাকে ভাস্কর পৌঁছে দিল উপরে। ঝি-এর জিম্মা করে দিল। শুইয়ে দিল বিছানায়।

'এ কি, তুমি ?' রুচিরা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'আমি নিচে যাই—তোমার বাবার কাছে।' নিচে নেমে গেল ভাস্কর।

এণাক্ষীর মারা যাবার পর থেকে জগৎপতি নিচেই শুচ্ছিলেন এখন অসুখ বাড়াবাড়ি হবার পর উপরে ওঠার আর প্রশ্নই ওঠে না।

জগৎপতি কেমন আছেন খোঁজ নেবার জন্যে ভাস্কর তাঁর ঘরে ঢুকল। জগৎপতি চিনতে পারলেন। এত কষ্টের মধ্যেও আনন্দের আভাস আনলেন মুখে।

'আর্জিটা দিন. সই করে দি।' ভাস্কর কাছে এসে দাঁড়াল।

'মন ঠিক করে ফেলছ ?' জিগগেস করলেন জগৎপতি।

'হ্যাঁ, ফেলেছি। নিজে কষ্ট পাই, ভালো, অন্যকে কষ্ট পেতে দেখলে আরো কষ্ট। কই; দিন আর্জিটা।' ভাস্কর হাত বাড়াল।

য়্যাটেণ্ডেণ্ট ছিল, জগৎপতির নির্দেশে নিয়ে এল ফাইল। আর্জিটা পড়ল। বিচ্ছেদের কারণ স্ত্রীর ব্যভিচার। কো-রেসপণ্ডেণ্ট কে ? কো-রেসপণ্ডেণ্ট অরিন্দম।

ভাস্কর পাতায় পাতায় সই করে দিল। ভাবল অরিন্দমের সমর্থনের জন্যে কত খেসারত না দিতে হয়েছে।

জগৎপতি কথা বাড়ালেন না, বললেন, 'অরিন্দম তো সমন পেয়ে চুপ করে থাকবে। তোমাকেই জবানবন্দি দিতে হবে দাঁড়িয়ে। আরেকবার একটু কষ্ট করতে হবে তোমাকে।'

'করব।'

'আমার জুনিয়র রয় তোমাকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেবে।'

'তার জন্যে আপনি ভাববেন না।'

'তবেই আমি রুচিকে মুক্তি কিনে দিতে পারব।' কষ্টে নিশ্বাস নিচ্ছেন জগৎপতি। য়্যাটেণ্ডেণ্টের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'জীবনে এই আমার এক যন্ত্রণার দায় ছিল তা আমি নির্বাহ করে গেলাম। মুক্তি এনে দিতে পারলাম রুচিকে। তারপর যা খুশি সে করুক, যেখানে খুশি সে যাক, তার মঙ্গল সে নিজে বুঝুক। আমি বাধা দেব না। আমার মোহ ঘুচেছে। আমি আর থাকবও না বাধা দিতে। নির্মল চোখে চোখ বুজতে পারব।'

'আমি তবে এখন চলি।'

'এস। উনি যদি আজ থাকতেন দেখে যেতে পারতেন আমার নির্বাচন ভুল হয়নি।' চলে যাচ্ছিল ভাস্কর, য়্যাটেণ্ডেণ্ট ফের ডেকে আনল। জগৎপতি বললেন, 'তোমার আপিস তোমাকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়েছে, তাই না ? আচ্ছা আমি দেখি।'

'এখুনি দেখবেন না।' হাসল ভাস্কর: 'জবানবন্দিটুকু এখনো বাকি আছে।'

'তা থাক।'

'তা ছাড়া ও চাকরি আমি করব না। ও বাড়িতে থাকব না। আমি আমার সত্য পরিচয়ে, স্বাধীন পরিচয়ে নেমে যাব।'

চলে গেল ভাস্কর। খোলা গেট বন্ধ করে দিয়ে গেল।

১৫

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় হয়ে গেল সমস্ত।

জবানবন্দি হল। ডিক্রি হয়ে গেল একতরফা।

আর রুচিরাকে পায় কে। দেখে কে। জানলায় গিয়ে দাঁড়াল রুচিরা। দেখল একটা বিরাট মিছিল বেরিয়েছে। কিসের মিছিল, কোথায় চলেছে এসব জিজ্ঞাসা তার মনে এল না। সে শুধু দেখল জনস্রোত। উদ্বেল জনস্রোত। এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পর্যন্ত চলেছে। অনুভব করল সেও তাদেরই একজন। সে এখুনি নেমে যেতে পারে মিশে যেতে পারে এগিয়ে যেতে পারে।

এক সন্ন্যাসী মিশনকে বাড়ি-ঘর সম্পত্তি—সমস্ত দান করে দিচ্ছেন জগৎপতি। জগৎপতি চোখ বুজলেই সেই দান কার্যকর হবে, অর্থাৎ দখল নিতে পারবে মিশন। আর রুচিরা? সম্পত্তির আয় থেকে তাকে কিঞ্চিৎ মাসোয়ারা দেওয়া হবে। আর তার আচরণ যদি মিশনের অনুমোদিত হয়, তা হলে, যতদিন না অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন তাকে এ বাড়িতে এককোণে একটু থাকতে দেবেন দয়া করে।

আর, এ বাড়ি পরে হাসপাতালই হোক বা ইস্কুলই হোক বা অন্য কোনো লোককল্যাণের প্রতিষ্ঠান, কোথাও না কোথাও, ক্ষুদ্রাক্ষরে হলেও চলবে, এণাক্ষীর নাম যেন কোথাও লেখা থাকে দেয়ালে।

'মেয়েটাকে যে একেবারে বঞ্চিত করছেন।' জুনিয়র রয় আপত্তি করেছিল একবার।

'কে জানে করছি কিনা। না, ওকে সত্যি মানুষ হতে সাহায্য করছি।' জগৎপতি অলক্ষ্য বেদনায় ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন: 'ওর হাতে সমস্ত সম্পত্তিটা ছেড়ে দিয়ে গেলে, বুঝতে পারছ, উচ্ছৃঙ্খল

হবার সুযোগ দেওয়া হবে, সব তছনছ হয়ে যাবে। মোটা আয় দিলে ও আরামে ডুববে, সংগ্রামে ওর ঝোঁক থাকবে না, আর স্বাধীনতা যে সংগ্রামের দ্বারাই শুদ্ধ হয়, সিদ্ধ হয়, ভুলে যাবে সে কথা।' বুকের ব্যথাটাকে একটু স্তিমিত হতে দেবার জন্যে কিছুক্ষণ চুপ করলেন জগৎপতি। পরে আবার বললেন, 'গরিবের প্রতি যে ওর সহানুভূতির ভাব ছিল সেটা কৃত্রিম, এবারই যদি সে-ভাব সত্য হয়। গরিব হতে ওর এতটুকুও বাধবে না, আমিও এককালে ঘোরতর গরিব ছিলাম। আর, তারপরেও যদি ও তরুণ সমিতিতে থাকে, তখন দেখবে সে সমিতির উদ্দেশ্য মন্ত্রী বানাবার দিকে থাকবে না, থাকবে মানুষ বানাবার দিকে।'

কিন্তু আজ সকালে, এত সকালে কে এল বাড়িতে? বারান্দা দিয়ে ঘুরে উপরে উঠে যাচ্ছে? কে, অরিন্দম?

য়্যাটেণ্ডেণ্ট বললে, 'না, অরিন্দম নয়।'

তবে, কে? আমি এখনো বেঁচে নেই? শুয়ে আছি বলে কি আমার কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে? দলিল তো এখনো এক্সিকিউট করিনি।

'কে?' প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন জগৎপতি।

'আমি শুভময়।'

সত্যি? বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করলেন জগৎপতি। শুভময় আলোয় এসে দাঁড়াতে স্পষ্ট করে দেখলেন, চিনলেন। বললেন, 'ফিরে এসেছ?'

'হ্যাঁ, শত বিপদ বাধা লাঞ্ছনার পরেও পেরেছি ফিরতে।' খুব হাসি-খুশি শুভময়ঃ 'দমদম থেকে বাড়ি হয়েই—'

'হ্যাঁ, সেইটেই বড় কথা—ফিরে আসা, ফিরে-ফিরে আসা।' ধীরে ধীরে বিছানায় কাত হলেন জগৎপতি।

'কেউ রুখতে পারল না।' দৃঢ় দীপ্ত কণ্ঠে শুভময় বললে, আরেকটা

ফার্মে চাকরি নিয়ে এসেছি। আগের সেই শয়তান ফার্মে নয়, আরেকটা ফার্মে। বিদেশী ফার্মে।'

'চাকরি পাওয়া অবান্তর। তোমাকে যে আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্রাইট দেখাচ্ছে তাও অবান্তর।' আবার পাশ ফেরবার চেষ্টা করলেন জগৎপতি: 'তুমি যে বেঁচে আছ তুমি যে ফিরে এসেছ তাই যথেষ্ট। যাও উপরে যাও, রুচি আছে, ভালো আছে—'

তিন লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে উঠে গেল শুভময়।

জগৎপতি বললেন, 'দলিলটা এবার তাহলে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হয়। পেয়েও পেল না বলে আর যারই দুঃখ হোক সন্ন্যাসীদের হবে না। তারা তো সমস্ত বিষয়-বাসনার ঊর্ধ্বে। যাদের জিনিস তাদেরই থাক—নেপোয় আর দই মারে কেন?'

উপরে এসে শুভময় দেখল, স্নান হয়ে গিয়েছে রুচিরার। আর খোলা চুলে অনেক লেখাপড়া নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে তার টেবিলে।

শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে উথলে উঠল রুচিরা। যেন ভূত দেখল। পারে স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় বললে, 'আরে, তুমি! তুমি কবে এলে?'

'এইমাত্র।'

'আরে, বোসো, বোসো। ভালো আছ তো? কত কথা যে বলার আছে তোমাকে।'

'আমারই বেশি বলার আছে।' চেয়ারে বসল শুভময়: 'তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার আছে। কিন্তু একটা কথা যদি শোনো, যদি বোঝো, সব তোমার বাবার কারসাজি, বাবার ষড়যন্ত্র—'

'না, না, আজ শুধু ক্ষমা, চার দিকে ক্ষমা।' টেবিলের দিকে পিঠ রেখে উঠে দাঁড়াল রুচিরা: 'আসল ষড়যন্ত্রী ভাগ্য, তাকেও ক্ষমা। জীবনেরই এত ঔদার্য আছে যে মৃত্যুকেও ক্ষমা করতে পারে; এমন কি সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি অপমানকেও পারে।'

'তবু আমার কথা সব শোনো।' বলতে শুরু করল শুভময়। বললে, 'আমার মধ্যে অন্ধ ত্বরা ছিল, দ্রুততা ছিল, কিন্তু পালানো ছিল না। ইচ্ছে ছিল দ্রুত বড়লোক হবার উপায় খুঁজে নিয়ে আসব। তোমার বাবার কাছে সামাজিক যোগ্যতা সাব্যস্ত করব। কিন্তু তোমার বাবাই পথে বসালেন। ফেলে দিলেন অকূল নিঃস্বতার মধ্যে। সকলের উপর অভিমান হল। কেন জানি না তোমারও উপর। নিজেরই ঠিকানা নেই, তোমার ঠিকানাও ভুলে গেলাম। আমার অবস্থাটা তুমি বোঝো, তুমিই বুঝবে —'

'আর এদিকে আমার অবস্থাটা?' খিল খিল করে হেসে উঠল রুচিরা। কায়দা করে, কাটা কাটা করে, দিতে লাগল খবরগুলো। পরে দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে খোলা চুলে উত্তাল আনন্দে বলে উঠল: 'সব চেয়ে বড় যে খবর সে হচ্ছে মুক্তি। মুক্তি।'

'অসীম কোথায়?'

'কে জানে কোথায়? কাশীতে না বৃন্দাবনে। না কি মরে গেছে। না কি মিশে গিয়েছে জনস্রোতে।'

'তা হলে আর ভাবনা কী।' শুভময়ও উঠে দাড়াল।

'না, আর ভাবনা কী।' আবার আরেক ঢেউ হাসি তুলল রুচিরা: 'অভিনয়ের চূড়ায় উঠে সিগারেট-মদও ছুঁতে হয়েছিল আমাকে। বাবা ভাবলেন পঙ্ককুণ্ডে তলিয়ে গেলাম বোধহয়। পিছনে সন্ন্যাসী লাগালেন। উপদেশের ধোঁয়ায় দম আটকে আসে আর কী। কিন্তু সমস্ত উপদেশের থেকে দুটো জিনিস খুব মনে ধরল। এ সব প্রেম সিগারেটের ধোঁয়া। কিছু ছাই ফেলে রেখে শূন্যে মিলিয়ে যাবার জিনিস। আর শরীরের মধ্যে যে রক্ত, যে বেঁচে থাকবার ঝাঁজ—সেই আসল মদ।'

'তা হলে এবার এস তোমার বাবাকে গিয়ে প্রণাম করি।' বললে শুভময়।

'মানে বিয়ে করি?' আবার আরেক পশলা হাসি ছড়াল রুচিরা : 'তুমি একা যাও।'

'একা?'

'হ্যাঁ, আমি আবিষ্কার করেছি আমি তোমাকেও ভালোবাসিনি শুধু একটা জেদের বশে, অপমানের প্রতিশোধ নেবার পাগলামিতে প্রতিহিংসায়, তোমাকে আঁকড়েছিলাম।' শান্ত, গম্ভীর, নিরুত্তাপ কণ্ঠে রুচিরা বললে, 'ওটা প্রেম নয়। তুমিও জানো, ওটা প্রেম নয়। ওটা সিগারেটের ধোঁয়া।'

'তা হলে?' দ্বিধায় দুর্বল হল শুভময় : 'ফিরে যাব?'

'ফিরে যাবে কেন, এগিয়ে যাবে। ফিরে গিয়েছে অরিন্দম। সে বিয়েতে রাজি নয়, অথচ কদাচারে রাজি। তাকেই দিয়েছি ফিরিয়ে।'

দৃঢ়, দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল শুভময়। জগৎপতির সঙ্গে দেখা না করেই বারান্দা দিয়ে চলে গেল গেটের দিকে।

'কি, কী হল?' যতদূর সাধ্য চেঁচিয়ে উঠলেন জগৎপতি।

কোনো উত্তর হল না। জগৎপতি বুঝলেন, কিছুই হবার নয়।

এই বিরাট স্তব্ধতা—এই বুঝি এক মুক্তির ডাক।

হস্তান্তরের দলিল সম্পাদন করে দিলেন জগৎপতি। আর সম্পাদন করে দিয়েই জগৎপতি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কখন প্রাণ যায় তারই অপেক্ষায় সন্ন্যাসীর দল তাঁকে সযত্নে পাহারা দিতে লাগল।

সেবা নয় পাহারা।

ভাগ্যের এমন রসিকতা, সাত দিনেও অজ্ঞানের শেষ হয় না. ছ-ঘণ্টা করে চারজন সন্ন্যাসী সিফট ডিউটিতে কাজ করছে। মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাড়িটার দখল নিয়ে নিতে হবে। তাড়িয়ে দিতে হবে ঐ অলক্ষণা মেয়েটাকে, নাম যার রুচিরা। যে মেয়েরা অনাথা, পথহারা, তাদেরই সেবা প্রতিষ্ঠান করে এ বাড়ি ব্যবহার করা হবে এই সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ স্থির করেছে। আগে দখল তো নিরর্গল হোক!